

शुणालिनी ।

बुद्धिचन्द्र चट्टोपाध्याय प्रणीत ।

—000—

“विभर्षि चाकारमनिर्वृतानां
शुणालिनी हैमनिबोपरागम् ।”

एकदश संस्करण ।

MARÉ PRESS : CALCUTTA.

1897'

मूल्य १५० टाका ।

PRINTED BY R DUIT,
HARE PRESS
40, BECHU CHATTERJEE'S STREET, CALCUTTA
AND
PUBLISHED BY UMACHARAN BANERJEE,
5, PRAIAP CHANDRA CHATTERJEE'S LANE, CALCUTTA



স্বর্ণালিনী ।

প্রথম খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আচার্য্য ।

একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গায়মুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব
আম্রাবটদিনাপ্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবটকাল,
সে কষ্ট মেঘ নাট, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময়
চরম্মালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্য-
আত্মদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা
হাতীমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশবীবা, যৌবনেব পাবিপূর্ণতায়
চন্দ্রাদিনী. যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলি-

জন . করিতেছিল । ঊর্ধ্বল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমা
পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল ।

একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন মাত্র নাবিক । ত
অসম্ভব সাহসে সেই দুর্দমনীয় যমুনার স্রোতাবেগে আ
হণ করিয়া, প্রয়াগেব ঘাটে আসিয়া লাগিল । এক
নৌকায় রহিল একজন তীরে নামিল । যে নামিল, তাহ
নবীন যৌবন, উন্নত বনিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধবেশ । মস্ত
উষ্ণীষ, অঙ্গ-কবচ, করে ধনুর্কাণ, পৃষ্ঠে তুণীষ, চর
অনুপদীনা । এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর ঘাট
উপরে, সংসারবিনাগী পুণ্যপ্রয়াসীদিগের কতক
আশ্রম আছে । তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এই যু
প্রবেশ করিলেন ।

কুটীরমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন ক
অপে . নিযুক্ত ছিলেন ; ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ
শরীর শুষ্ক ; আয়ত মুপমণ্ডলে শ্বেতশ্মশ্রু . বিরাজিত
ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র বিভূতিশোভ
ব্রাহ্মণের কান্তি গস্তীর্ণ এবং কটাক্ষ কঠিন ; দেখি
তাঁহাকে নির্দয় বা অর্ভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হইয়
সস্তাবনা ছিল না, অথচ শঙ্কা হইত । আগন্তুক
দেখিবামাত্র তাঁহার সে পুরুষভাব যেন দূর হইল, মু

গাঙ্গীর্য্যমধ্যে প্রসাদেব সঞ্চার হইল । আগন্তুক, ব্রাহ্মণকে, প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ কবিতা কহিলেন, -

“বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমাব তীক্ষ্ণা কবিত্তেছি ।”

হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, “অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই । পরন্তু, যখন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছিল, এই জগু কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল । তদ্ব্যতীত বিলম্ব হইয়াছে ।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “দিল্লীতে সংবাদ আমি সকল শুনিয়াছি । বখ্তিয়ার খিলজিকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শত্রু পশু-হস্তে নিপাত হইত । তুমি কেন তাব প্রাণ বাঁচাইতে গেলে !”

‘ হেমচন্দ্র । তাহাকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া । সে আমাব পিতৃশত্রু, আমাব পিতাব রাজ্যচোর । আমাবই সে বধা ।

ব্রাহ্মণ । তবে তাহার উপর যে হাতী বর্ষণ করা হইয়াছিল, তুমি বখ্তিয়ারকে না মারিয়া সে হাতীকে মারিলে কেন ?

হেমচন্দ্র । আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শত্রু

মাঝিৰ ? আমি মগধবিজেতাকে যুদ্ধে জয় কৰিয়া পিতাৰ
ৰাজ্য উদ্ধাৰ কৰিব । নহিলে আমাৰ মগধ-ৰাজপুত্র
নামে কলঙ্ক ।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, “এ সকল ঘটনা
ত অনেক দিন হইয়া গিয়াছে. ইহাৰ পূৰ্বে তোমাৰ
এখানে আসাৰ সম্ভাবনা ছিল । তুমি কেন বলিব
কবিলে ? তুমি মথুৰায় গিয়াছিলে ?”

হেমচন্দ্র অধোবদন হইলেন । ব্রাহ্মণ কহিলেন,
“বুঝিলাম তুমি মথুৰায় গিয়াছিলে, আমাৰ নিষেধ গ্রাহ্য
কৰ নাই । যাহাকে দেখিতে মথুৰায় গিয়াছিলে, তাহাৰ
কি সাক্ষাৎ পাইবাছ ?”

এবাৰ হেমচন্দ্র রুষভাবে কহিলেন, “সাক্ষাৎ যে
পাইলাম না, সে আপনাবই দয়া । মৃগালিনীকে আপনি
কোথায় পাঠাইয়াছেন ?”

মাধবাচাৰ্য্য কহিলেন, “আমি যে কোথায় পাঠাইয়াছি,
তাহা তুমি কি প্রকাৰে সিদ্ধান্ত কবিলে ?” -

হে । মাধবাচাৰ্য্য ভিন্ন এ মন্ত্ৰণা কাহার ? আমি
মৃগালিনীৰ ধাত্ৰীৰ মুখে শুনিলাম যে, মৃগালিনী আমাৰ
আজ্ঞাটি দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আৰ তাহাৰ উদ্দেশ
নাই । আমাৰ আজ্ঞাটি আপনি পাঠ্যে জ্ঞাত চাহিয়া

লইয়াছিলেন । আগ্রটির পরিবর্তে অল্প রত্ন দিতে চাহিয়া-
ছিলাম, কিন্তু আপনি লন নাই । তখনই আমি সন্নি-
হান হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে অদেয় আমাব কিছুই
নাই, এই জুগুই বিনা দিশাদে আগ্রটি দিয়াছিলাম । কিন্তু
আমার সে অসতর্কতাব আপনিই সমুচিত প্রতিফল
দিয়াছেন ।

মাধবাচাৰ্য্য কহিলেন, “যদি তাহাই হয়, আমার
উপব নাগ করিও না । তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে
সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে?
যবননিপাত তোমাব একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত ।
এখন মৃগালিনী তোমাব মন অধিকার করিবে কেন?
একবার তুমি মৃগালিনীৰ আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে
বালবা তোমাব বাপেৰ বাজ হারাইয়াছ ; যবনাগমনকালে
হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকবা মগধে থাকিত, তবে
মগধজয় কেন হইবে? আবার কি সেই মৃগালিনী-পাশে-বদ্ধ
হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? মাধবাচার্য্যেৰ জীবন থাকিতে
তাহা হইবে না । সুতরাং যেখানে থাকিলে তুমি মৃগা-
লিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি ।”

হে । আপনিৰ দেবকার্য্য আপনি উদ্ধার করুন ;
আমি এই পর্য্যন্ত ।

মণালিনী ।

মা । তোমার দুর্কর্মে ঘটিয়াছে । এই কি তোমার দেবভক্তি ? ভাল, তাহাই না হউক, দেবতার আশ্রয় সাধন জন্য তোমার ঋণ মনুষ্যের সাহায্যের অপেক্ষা কবেন না । কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি নী হও, তবে তুমি কি প্রকারে পুত্রশাসন হইতে অবসর পাইতে চাও ? এই কি তোমার বীরগর ? এই কি তোমার শিক্ষা ? বাজবংশে জন্মিয়া কি একাধে শ্বাশনার বাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছে ?

হে । রাজ্য—শিক্ষা—গর্ব অতল জলে ডুবিয়া ষাউক ।

মা । নবাধম । তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিল ? কেনই বা ছাদশ বর্ষ দেবাবাধনা ত্যাগ করিয়া এ পাবকে সকল বিদ্যা শিখাইলেন ?

মাধবাচার্য্য অনেককাল নীচবে কবলথকপোল হইয়া বহিলেন । ক্রমে হেমচন্দ্রের অনিন্দ্য পুত্রের মুখকান্তি মধুর-মবোচি-বিশোধিত স্থলপদ্মবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু গর্ভাগ্নিগিরি-শিখর তুলা, তিনি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন । পরিশেষে মাধবাচার্য্য কহিলেন, “হেমচন্দ্র, ধৈর্য্যাবলম্বন কর । মণালিনী কোথায়

তাহা বলিব—মৃগালিনী সহিত তোমার বিবাহ দেওয়া-
ইব। কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শের অনুবর্তী হও,
আগে আপনার কাজ সাধন কর।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “মৃগালিনী কোথায় না বলিলে
আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আর যদি মৃগালিনী মরিয়া
থাকে?”

হেমচন্দ্রের চক্ষু হুইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল।
তিনি কহিলেন, “তবে সে আপনারই কাজ।” মাধবাচার্য্য
কহিলেন, “আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকাষ্যের
কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি।”

হেমচন্দ্রের মুখকান্তি বর্ষণোন্মুখ মেঘবৎ হইল। ব্রহ্ম-
হস্তে ধনুকে শব্দসংযোগ করিয়া কহিলেন, “যে মৃগালিনীর
বধকর্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা
উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।”

মাধবাচার্য্য হাস্য করিলেন, কহিলেন, “গুরুহত্যার
ব্রহ্মহত্যার তোমার যত আনন্দ, স্ত্রীহত্যার আমার তত
নহে। এক্ষণে তোমাকে পাতকের ভাগী হইতে হইবে
না। মৃগালিনী জীবিতা আছে। পার, তাহার সন্ধান
করিয়া সাক্ষাৎ কর। এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে

স্থানান্তরে যাও । আশ্রম কলুষিত করিও না ; অপাত্রে আমি কোন ভার দিই না ।” এই বলিয়া মাধবাচার্য্য পূর্ববৎ জপে নিযুক্ত হইলেন ।

হেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন । ঘাটে আসিয়া ক্ষুদ্র তরনী আরোহণ করিলেন । যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নোকায় ছিল, তাহাকে বলিলেন “দিগ্বিজয় । নোকা ছাড়িয়া দাও ।”

দিগ্বিজয় বলিল “কোথায় যাইব ?” হেমচন্দ্র বলিলেন, “যেখানে ইচ্ছা—যমালয় ।”

দিগ্বিজয় প্রভুব স্বভাব বৃক্ষিত । অক্ষুটস্ববে কহিল, “সেটা অল্প পথ ।” এই বলিয়া সে তরনী ছাড়িয়া দিয়া শ্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল ।

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে কহিলেন, “দূব হুউক ! ফিরিয়া চল ।”

দিগ্বিজয় নোকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগেব ঘাটে উপনীত হইল । হেমচন্দ্র লক্ষ্যে তীরে অবতরণ করিয়া পুনর্বার মাধবাচার্য্যের আশ্রমে গেলেন ।

তাহাকে দেখিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, “পুনর্বার কেন আসিয়াছ ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই

স্বীকার করব। মৃগালনা কোথায় আছে আজ্ঞা করুন।”

মা। তুমি সত্যবাদী--আমার আজ্ঞাপালন করিতে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গোড়নগবে এক শিষ্যের বাটীতে মৃগালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে ঘাইতে হইবে, কিন্তু তুমি তাহাব সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যের প্রতি আমার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, যতদিন মৃগালিনী তাহার গৃহে থাকিবে, ততদিন সে পুরুষান্তরেব সাক্ষাৎ না পায়।

হে। সাক্ষাৎ না পাই, যাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে কি কার্য্য করিতে হইবে অনুমতি করুন।

মা। তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা কি জানিয়া আসিয়াছ?

হে। যবনের বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। অতি দ্রুত বখতিয়ার খিলিজি সেনা লইয়া, গোড়ে যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্য্যেব মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন, “এত দিনে বিধাতা বুঝি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন।”

হেমচন্দ্র একতানমনে মাধবাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া

তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন,

“কয়মাস পর্য্যন্ত আমি কেবল গণনার নিযুক্ত আছি । গণনার গ্রাহ্য ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপত্ত্ব হইয়াছে, তাহা কলিবার উপক্রম হইয়াছে ।”

হেম । কি প্রকার ?

মা । গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে ।

হে । তাহা হইতে পারে । কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে ? আর ক্রাহ্য কর্তৃক ?

মা । তাহাও গণিয়া স্থির কবিয়াছি । যখন পশ্চিম-দেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবেক ।

হে ! তবে আমার জয়লাভের কোথা সম্ভাবনা ? আমি ত বণিক নহি ।

মা । তুমিই বণিক । মথুরায় যখন তুমি মৃগালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে ?

হে । আমি তখন বণিক বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে ।

মা। স্মৃতবাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক। গোড়-
রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবননিপাত হইবে।
তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই
গোড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্য্যন্ত সেখানে না যবনের
সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্য্যন্ত মৃগালিনীর সহিত সাক্ষাৎ
করিবে না।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “তাহাই
স্বীকার করিলাম। কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি
করিব ?”

মা। গোড়েশ্বরের সেনা আছে।

হে। থাকিতে পারে—সে বিষয়েও কতক সন্দেহ;
কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে
কেন ?

মা। তুমি আগে যাও। নবদ্বীপে আমার সহিত
সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানে গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ
করা যাইবে। গোড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত
আছি।

“যে আজ্ঞা” বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায়
হইলেন। যতক্ষণ তাহার বীরমূর্ত্তি নয়নগোচর হইতে
লাগিল, আচার্য্য ততক্ষণ তৎপ্রতি অনিমেষলোচনে

চাহিয়া রহিলেন । আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন,
মাধবাচার্য্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন,

“যাও, বৎস ! প্রতি পদে বিজয়লাভ কর । 'যদি
ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাকুরও
বিধিবে না । মৃগালিনী ! মৃগালিনী পাখী আমি
তোমারই জন্তে পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি । কিন্তু কি
জানি, পাছে তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ
ভুলিয়া যাও, এইজন্ত তোমাব পরম মঙ্গলাকাজক্ষী ব্রাহ্মণ
তোমাকে কিছুদিনের জন্ত অনঃপীড়া দিতেছে ।”

দ্বিতীয় পারচ্ছেদ

পিঞ্জরের বিহঙ্গী ।

লক্ষ্মণাবতী-নিবাসী হৃষীকেশ সম্পন্ন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ
নহেন । 'তাঁহার বাসগৃহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল । তাঁহার
অন্তঃপ্রমধ্যে যথায় দুইটি তরুণী কঙ্কপ্রাচীবে আলেখ্য
লিখিতেছিলেন, তথায় পাঠক মহাশয়কে দাঁড়াইতে

হইবে। উভয় স্রমণীই আত্মকর্মে সবিশেষ মনোভি-
নিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন পরস্পরের সহিত
কথোপকথনের কোন বিষয় জন্মিতেছিল না। সেই
কথোপকথনের মধ্যভাগ হইতে পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে
আরম্ভ করিব।

এক যুবতী অপরকে কহিলেন, “কেন, মৃগালিনি,
কথায় উত্তর দিস না কেন? আমি সেই রাজপুত্রটীর কথা
শুনিতে ভালবাসি।”

“সই মৃগালিনি! তোমার সূতের কথা বল, আমি
আনন্দে শুনিব।”

মৃগালিনী কহিল, “আমাব° সূতের কথা শুনিতে
শুনিতে আমিই জ্বালাতন হইয়াছি, তোমাকে কি
শুনাইব?”

মৃ। তুমি শোন কার কাছে—তোমার স্বামীর
কাজে?

মৃগি। নহিলে আর কারও কাছে বড় শুনিতে পাই
না। এই পদ্যটি কেমন আঁকিলাম দেখ দেখি?

মৃ। ভাল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে পদ্য
অনেক উর্দ্ধে আছে, কিন্তু সরোবরে সেরূপ থাকে না;
পদ্যের কোটা জলে লাগিয়া থাকে, চিত্রেও সেইরূপ হইবে।

আর কয়েকটা পদ্মপত্র লাগুক ; নহিলে পদ্মের শোভা স্পষ্ট হয় না। আরও, পার যদি, উহার নিকট একটি রাজহাঁস আঁকিয়া দাও।

মণি। হাঁস এখানে কি করিবে ?

— মৃ। তোমার স্বামীর মত পদ্মের কাছে সুখের কথা কহিবে।

মণি। (হাসিয়া) দুই জনেই সুকণ্ঠ বটে। কিন্তু আমি হাঁস লিখিব না। আমি সুখের কথা শুনিয়া শুনিয়া জ্বালাতন হইয়াছি।

মৃ। তবে একটি খঞ্জন আঁক।

মণি। খঞ্জন আঁকিব না। খঞ্জন পাখা বাহিব কবিয়া উড়িয়া যাইবে। এ ত মৃগালিনী নহে যে, স্নেহ শিকলে বাধিয়া বাধিব।

মৃ। খঞ্জন যদি এমনই দৃষ্ট হয়, তবে মৃগালিনীকে যেমন পিঞ্জরে পুরিয়াছ খঞ্জনকেও সেইরূপ করিও !

ম। আমরা মৃগালিনীকে পিঞ্জরে পুরি নাই—সে আপুনি আসিয়া পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে।

মৃ। সে মাধবাচার্য্যের গুণ।

ম। সখি তুমি কতবার বলিয়াছ যে, মাধবাচার্য্যের সেই নিষ্ঠুর কাজের কথা সবিশেষ বলিবে। কিন্তু কই,

আজও বলিলে না। কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথা
পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে ?

মৃ। মাধবাচার্য্যের কথা আসি নাই। মাধবা-
চার্য্যকে আমি চিনিলাম না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক
এখানে আসি নাই। এক দিন সন্ধ্যার পর, আমায় দাসী
আমাকে এই আঙ্গুটি দিল ; এবং বলিল যে, যিনি এই
আঙ্গুটি দিয়াছেন, তিনি ফুলবাগানে অপেক্ষা করিতেছেন।
আমি দেখিলাম যে উহা হেমচন্দ্রের সঙ্কেতের আঙ্গুটি।
ঊর্ধ্বার সাক্ষাতের অভিল্লাষ থাকিলে তিনি এই আঙ্গুটি
পাঠাইয়া দিতেন। আমাদিগের বাটীর পিছনেই বাগান
ছিল। যমুনা হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া
বেড়াইত। তথায় ঊর্ধ্ব সহিত সাক্ষাৎ হইত।

মণিমালিনী কহিলেন, “ঐ কথাটি মনে পড়িলেও
আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকাবে
পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে ?”

মৃ। অসুখ কেন সখি—তিনি আমার স্বামী। তিনি
ভিন্ন অন্য কেহ কখন আমার স্বামী হইবে না।

ম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত তিনি স্বামী হয়েন নাই।
রাগ করিও না সখি ! তোমাকে ভগিনীর গায় ভাষাসি ;
এই জন্য বলিতেছি।

মৃগালিনী অধোবদনে রহিলেন । ক্রণেক পবে চক্ষুর জল মুছিলেন । কহিলেন, “মণিমালিন! এ বিদেশে আমার আত্মীয় কেহ নাই । আমাকে ভাল কথা বলে এমন কেহ নাই । যাহারা আমাকে ভালবাসিত, তাহা দিগের গহিত যে, আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে, নে ভরসাও করি না । কেবলমাত্র তুমি আমাব সখি—তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে আর ভালবাসিবে ?”

ম । আমি তোমাকে ভালবাগিব, বাসিয়াও থাকি, কিন্তু যখন ঐ কথাটি মনে পড়ে, তখন মনে করি—

মৃগালিনী গুনশচ নীরবে রোদন করিলেন । কহিলেন, “সখি, তোমার মুখে এ কথা আমার সহ্য হয় না । যদি তুমি আমার নিকটে শপথ কর যে যাহা বলিত তাহা এ সংসারে কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিবে না, তবে তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ কবিয়া বলিতে পারি । তাহা হইলে তুমি আমাকে ভালবাসিবে ।”

ম । আমি শপথ করিতোঁছি ।

মৃ । তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে । তাহা ছুঁয়ে শপথ কর ।

মণিমালিনী তাই করিলেন ।

তখন মৃগালিনী মণিমালিনার কাণে যাহা কহিলেন,

তাহার এক্ষণে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।
শ্রবণে মণিমালিনী পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন। গোপন-
কথা সমাপ্ত হইল।

মণিমালিনী কহিলেন, “তাহার পর, মাধবাচার্য্যের
সঙ্গে তুমি কি প্রকারে আসিলে? সে বৃত্তান্ত বলিতেছিলে
বল।”

মণিমালিনী কহিলেন, “আমি হেমচন্দ্রের আশ্রুতি
দেখিয়া তাঁকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে দুর্গী
কহিল যে, রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে
লাগিয়া রহিয়াছে। আমি অনেক দিন রাজপুত্রকে দেখি
নাই। বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাই বিবেচনাশূন্য হই-
লাম। তীব্র আসিয়া দেখিলাম যে, যথার্থই একখানি
নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার বাহিবে একজন
পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মনে করিলাম যে, রাজপুত্র
দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকট আসিলাম।
“নৌকার উপর যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আমার
হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অগ্নি নাবিকেরা
নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শই বুঝিলাম, যে
এ ব্যক্তি হেমচন্দ্র নহে।”

মণি। আর কখন তুমি চীৎকার করিলে?

যু। চীৎকার করি নাই। একবার ইচ্ছা করিয়াছিল
বটে, কিন্তু চীৎকার আছিল না।

মণি। আমি হইলে জলে ঝাঁপ দিতাম।

যু। হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া কেন মবিব ?

মণি। তার পর কি হইল ? . . .

যু। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে “মা” বলিয়া বলিল,
“আমি তোমাকে মাতৃসম্বোধন করিতেছি—আমি তোমার
পুত্র, কোন আশঙ্কা কবিও না। আমার নাম মাধবা-
চার্য্য, আমি হেমচন্দ্রের গুরু। কেবল হেমচন্দ্রের গুরু
এমত নহি; ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের
সহিত আমার সেই স্বস্বন্ধ। আমি এখন কোন দৈবকার্য্যে
নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার প্রধান সহায়;
তুমি তাহার প্রধান বিদ্বান।”

আমি বলিলাম “আমি বিদ্বান ?” মাধবাচার্য্য কহিলেন,
“তুমিই বিদ্বান। যবনদিগের জয় করা, হিন্দুবাজ্যের পুন-
রুদ্ধার করা, সুসাধ্য কর্ম্ম নহে; হেমচন্দ্র ব্যতীত কাহারও
সাধ্য নহে; হেমচন্দ্রও অনন্তমনা না হইলে তাঁর দ্বারাও
এ কৃষ্ণ সিদ্ধ হইবে না। যত দিন তোমার সাক্ষাৎলাভ
সুশুভ থাকিবে, তত দিন হেমচন্দ্রের তুমি ভিন্ন অন্য ব্রত
নাই—সুতরাং যবন মারে কে ?” আমি কহিলাম, “বৃষ্টি-

লাম প্রথমে আমাকে না মাঝিলে যবন মারা হইবে না।
আপনার শিষ্য কি আপনার দ্বারা আজুটি পাঠাইয়া
দিয়া আমাকে মরিতে আজ্ঞা করিয়াছেন ?”

মণি । .এত কথা বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে ?

মৃ । আমাব বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথা
আমার হাড় জলিয়া গিয়াছিল, আর বিপৎকালে লজ্জা
কি ? মাধবাচার্য্য আমাকে মুখরা মনে কবিলেন, মূঢ়
হাসিলেন, কহিলেন, “আমি যে তোমাকে এইরূপে হস্ত-
গত করিব, তাহা হেমচন্দ্র জানেন না।”

আমি মনে মনে কহিলাম, তবে যাঁহাব জগৎ এ জীবন
রাখিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে জীবন ত্যাগ
করিব না। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, “তোমাকে
প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না—কেবল আপাততঃ হেম-
চন্দ্রকে ত্যাগ কবিত্তে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম
মঙ্গল।” যাহাতে তিনি রাজোশ্বর হইয়া তোমাকে রাজ-
মহিষী করিতে পারেন, তাহা কি তোমাব কর্তব্য নহে ?
তোমার প্রণয়মন্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন,
তাঁহার সে ভাব দূর করা কি উচিত নহে ?” আমি
কহিলাম, “আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত
হয়, তবে তিনি কদাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ

করিবেন না।” মাধবচাঁর্য্য বলিলেন, “বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বৃদ্ধা উভয়ের বিবেচনা শক্তি তুল্য; কিন্তু তাহা নহে। হেমচন্দ্রের অপেক্ষা আমরাদিগের পরিণামদর্শিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও না। আর তুমি সম্মত হও বা না হও, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা করিব। আমি তোমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইব। গোড় দেশে অতি শাস্ত্রস্বভাব এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তোমাকে রাখিয়া আসিব। তিনি তোমাকে আপন কন্যার স্থায় যত্ন করিবেন। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার ঠিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সেই সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকুন, তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য কবিলাম।” এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তক হইলাম। তাহার পর এই খানে আসিয়াছি। এ কি ঐ সেই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভিখারিণী ।

সখীদ্বয় এই সকল কথাবার্তা কহিতোছলেন, এমন সময়ে কোমলকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল ।

“মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি,
শ্যামবিলাসিনি—রে ।”

মৃগালিনী কহিলেন, “সই, কোথায় গান করিতেছে ?”

মণিমালিনী কহিলেন, “বাহির বাড়ীতে গায়িতেছে !”

গায়ক গায়িতে লাগিল ।

“কহু লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী—রে ।”

মৃ। সখি ! কে গায়িতেছে জান ?

মণি । কোন ভিখারিণী হইবে ।

আবার গীত ।

“বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,
কাহে তু তেয়াগী—রে ;
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর,
ফিরে তুয়া লাগি—রে ।”

মৃগালিনী বেগেৱৎ সহিত কহিলেন, “সই !, সই !
উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন ।”

মৃগালিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন । ততক্ষণ
সে গায়িতে লাগিল ।

“বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে ।
চন্দ্রমাশালিনি, য় মধুযানিনী,
না মিটল আশা—রে ।’
‘সা নিশা—সমরি—”

এমন সময়ে মৃগালিনী, উহাকে ডাকিয়া বাটীর
ভিতর আনিলেন ।

সে অস্তঃপুরে আসিয়া পূর্ববৎ গায়িতে লাগিল ।

“সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি,
কাহা মিলে দেখা—রেণু
শুনি যাওয়ে চলি, বাজুঘি মুরলী,
বনে বনে একা—রে ।”

মৃগালিনী তাহাকে কহিলেন, “তোমার দিব্য গলা,
তুমি গীতটি আবার গাও ।”

গায়িকার বয়স ষোল বৎসব । ষোড়শী, খৰ্ব্বাকৃত্য
এবং কৃষ্ণাঙ্গী । সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা । তাই বলিয়া তাহার

গায়ের ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিরাছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমন নহে । যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ । কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে । তাহার অঙ্গ পরিষ্কার সুমার্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট ; মুখধানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটি বড় চঞ্চল, হাস্যময় ; লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটি তাবার পাশ্বে একটি তিল । ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পবিষ্কার অমলখেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত । কেশগুলি সুক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যুথিকার মালা বেষ্টিত । যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল । পরিচ্ছদ অতি সূক্ষ্ম ; কিন্তু পরিষ্কার—ধূলিকর্দমপরিপূর্ণ নহে । অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে । প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয় ; গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকার ক্ষুদ্র একটি তিলক, জন্মখো ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপ । সে আজ্ঞামত পূর্ববৎ গায়িতে লাগিল ।

“মথুরাবাসিনি, মধুহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি—রে ।*
 কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনি—রে ॥
 বৃন্দাবনান, গোপিনীমোহন, কাহে তু ভেরাগী—রে ।
 দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুরা লাগি—রে ॥
 বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে, বহুত পিয়াসা—রে ।
 চল্লমাশালিনী, ষা মধুযামিনী, না মিটল আশা—রে ॥
 সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি, কাঁহা মিলে দেখা—রে ।
 গুনি, ষাওরে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা—রে ॥”

গীত সমাপ্ত হইলে মৃগালিনী কহিলেন “তুমি সুন্দর
 গাও । সেই মণিমালিনি, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয় ।
 একে কিছু দাও না ?”

• মণিমালিনী পুবঙ্কার আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে
 মৃগালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
 “শুন, ভিখারিণি ! তোমার নাম কি ?”

ভিখা । আমার নাম গিরিজায়া ।

মৃগা । তোমার বাড়ী কোথায় ?

গি । এই নগরেই থাকি ।

মৃ । তুমি কি গীত গাইয়া দিনপাত কর ?

গি । আর কিছুই তু জানি না ।

মৃ । তুমি গীত সকল কোথায় পাও ?

* এই গীত চিমে তেতাল তাল যোগে অস্বর্জস্বর্তী রাগিণীতে গের ।

গি । যেখানে যা পাই । তাই শিখি ।

মৃ । এ গীতটি কোথায় শিখিলে ?

গি । একটি বেগে আমাকে শিখাইয়াছে ।

মৃ । সে বেগে কোথায় থাক ?

গি । 'এই নগরেই' আছে ।

মৃণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—প্রাতঃসূর্য্যকরস্পর্শে
যেন পদ্ব ফুটিয়া উঠিল । কহিলেন,

“বেগেতে বাণিজ্য করে—সে বণিক, কিসের বাণিজ্য
করে ?”

গি । সবার যে ব্যবসা তারও সেই ব্যবসা ।

মৃ । সে কিসের ব্যবসা ?

গি । কথার ব্যবসা ।

মৃ । এ নূতন ব্যবসা বটে । তাহাতে লাভালাভ
কি রূপ ?

গি । ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, অন্য
কোনদল ।

মৃ । তুমিও ব্যবসায়ী বট । ইহার মহাজন কে ?

গি । যে মহাজন ।

মৃ । তুমি ইহার কি ?

গি । নগ্না মুটে ।

মৃ। ভাল তোমহঁর বোঝা নামাও। সামগ্রী কি আছে দেখি।

গি। এ সামগ্রী দেখে না ; শুনে।

মৃ। ভাল—শুনি।

গিরিজায়া গাধিতে লাগিল।

“যমুনার জলে মোর, কি মিথি মিলিল।
 ঝাপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
 পরেছিছু কুতূহলে, যে যতনে।
 নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
 কণ্ঠের কাটিল ডোর, মণি হরে নিল।”

মৃগালিনী, বাষ্পপীড়িতলোচনে, গদগদস্বরে, অথচ হাসিয়া কহিলেন, “এ কোন্ চোরের কথা ?”

গি। বেগে বলেছেন, চুরিয ধন লইয়াই তাঁহার ব্যাপার।

মৃ। তাঁহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের ঐশ্বর্য বাঁচে না।

গি। বুঝি ব্যাপারিও নয়।

মৃ। কেন, ব্যাপারি কি ?

গিরিজায়া গাধিল।

“ঘাট বাট তট মাঠ ফিবি ফিরনু বই দেশ ।
কাঁহা মেরে কাঁস্তু বরণ, কাঁহা রাজবেশ ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভাবি ।
সহি পঙ্কজ কাঁহা মোব, কাঁহা মৃগাল হামাবি ॥”

মৃগালিনী, স্নেহে কোমল স্বরে কহিলেন, “মৃগাল
কোথায় ? আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে
রাখিতে পারিবে ?”

গি । পারিব—কোথায় বল ।

মৃগালিনী বলিলেন,

“কণ্টকে গঠিল বিবি, মৃগাল অধমে ।
জলে তারে ডুবাইল পাঁড়িয়া মরমে ॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন ।
চবণ বেড়িয়া তাবে, কবিল বন্ধন ॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন ।
হৃদয়কমলে মোর, তৌমাব আসন ॥
আনিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে ।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃগালিনী জলে ॥
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে ।
উডিল মবালবাজ, মানস বিলাসে ॥
ভাস্কিন হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে ।
ডুবিয়া অতল জলে, মৃগালিনী মবে ॥

কেমন গিরিজায়া গীত শিখিতে পারিবে ?”

গিরি । তা পারিব । চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি
শিখিব ?

মৃ। না। এ ব্যবসারে আমার লাভের মধ্যে
ঐটুকু ।

মৃগালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস
করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মণিমালিনীও পদধ্বনি
শুনতে পাইলেন। মণিমালিনী তাঁহাব স্নেহশালিনী
সখী—সকলই জানিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী
পিতৃপ্রতিজ্ঞাভঙ্গের সহায়তা করিবে, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস
জন্মিল না। কাজেই তিনি এ সকল কথা সখীর নিকট
গোপনে যত্নবতী হইয়া গিবিজায়াকে কহিলেন, “আজি
আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার
বোঝা কাল আবার আনিও। যদি কিনিবার কোন
সামগ্রী থাকে, তবে তাহা আমি কিনিব।”

গিবিজায়া বিদায় হইল। মৃগালিনী যে তাহাকে
পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা
ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গিরিজায়া কৃতিপন্ন পদ গমন করিলে মণিমালিনী
কিছু চাউল, একছড়া কলা, একখানি পুরাতন বস্ত্র,
আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন। আবার
মৃগালিনীও একখানি পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবাব
সময়ে উহার কাণে কাণে কহিলেন, “আমার ধৈর্য্য

হইতেছে না, কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না ;
তুমি আজ রাতে প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের
উত্তর দিকে প্রাচীরমূলে অবস্থিতি করিও ; তথায়
আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক যদি আসেন,
সঙ্গে আনিও।”

গিরিজায়া কহিল, “বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব।”

মৃগালিনী মণিমালিনীর নিকট প্রত্যাগতা হইলে
মণিমালিনী কহিলেন, “সুই, ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি
বলিতেছিলে ?”

মৃগালিনী কহিলেন,

“কি বলিব সুই—

সুই মনের কথা সুই, সুই মনের কথা সুই—

কাণে কাণে কি কথাটি বলে দিলি ওই ॥

সুই ফিরে ব'না সুই, সুই ফিরে ব'না সুই।

সুই কথা কৌন কথা কব, নইলে কারো নই।”

মণিমালিনী হানিয়া কহিলেন

“হ'লি কি লো সুই ?”

• মৃগালিনী কহিলেন,

“তোমারই সুই।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—o—o—

দূতী।

লক্ষণাবতী নগরীর প্রদেশান্তবে সর্কধন বণিকেব
 বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। বণিকেব
 গৃহদ্বাবে এক অশোকবৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল ; অপবাক্তে
 তাহাব তলে উপবেশন করিয়া, একটি কুমুদিত অশোক-
 শাখা নিশ্চরোজনে হেমচন্দ্র ছুরিকা দ্বাৰা খণ্ড খণ্ড করিতে-
 ছিলেন, এবং মুহুমুহঃ পথ প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, যেন
 কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। কাহারও প্রতীক্ষা করিতে-
 ছিলেন, সে আসিল না। ‘ভৃত্য দ্বিগ্বিজয় আসিল, হেম-
 চন্দ্র দ্বিগ্বিজয়কে কহিলেন, ‘

“দ্বিগ্বিজয়, ভিখারিণী আজি এখনও আসিল না।
 আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি একবার তাহাব সন্ধান
 যাও।”

“যে আজ্ঞা” বলিয়া, দ্বিগ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধান
 চলিল। নগরীর রাজপথে গিরিজায়ার সহিত তাহার
 সাক্ষাৎ হইল।

গিরিজায়া বলিল, “কেও দিক্বিজয় ?” দিগ্বিজয় রাগ করিয়া কহিল, “আমার নাম দিগ্বিজয়।”

গি। ভাল দিগ্বিজয়—আজি কোন্ দিক্ জয় করিতে চলিয়াছ ?

দি। তোমাব দিক্ :

গি। আমি কি একটা দিক্ ? তোর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই।

দি। কেমন কবিয়া থাকিবে—তুমি যে অন্ধকাব। এখন চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন।

গি। কেন ?

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।

গি। কেন তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবাব আর লোক জুটিল না।

দি। না। সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। এখন চল।

গি। পরের জন্মই মলেম। তবে চল।

এই বলিয়া গিরিজায়া দিগ্বিজয়েব সঙ্গে চলিলেন। দিগ্বিজয়, অশোকতলস্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া অন্ত্র গমন কবিল। হেমচন্দ্র অন্ত্রমানে মূহু মূহু গাইতেছিলেন,

“বিকচ নলিনেঃ যমনা-পলিনেঃ বহত পিয়াসা রে—”

গিরিজায়া পশ্চাৎ হইতে গাথিল,

“চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা রে ।”

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল ।
কহিলেন,

“কে গিরিজায়া ! আশা কি মিটল ?”

গি । কার আশা ? আপনার না আমার ?
হে । আমার আশা । তাহা হইলেই তোমার
মিটিবে ।

গি । আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে ? লোকে
বলে রাজা রাজ্জীব আশা কিছুতেই মিটে না ।

হে । আমার অতি সামান্য আশা ।

গি । যদি কখন মৃগালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ
কথা তাঁহার নিকট বলিব ।

হেমচন্দ্র বিষণ্ণ হইলেন । কহিলেন, “তবে কি আজিও
মৃগালিনীর সন্ধান পাও নাই ? আজি কোন্ পাড়ায় গীত
গাইতে গিয়াছিলে ?”

গি । অনেক পাড়ায়—সে পরিচয় আপনার নিকট
নিত্য নিত্য কি দিব ? অথ কথ্য বলুন ।

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “বুঝিলাম
বিধাতা বিমুখ । ভাল পুনর্বার কালি সন্ধানে যাইবে ।”

গিরিজায়া তখন প্রণাম করিয়া কপট বিদায়ের উদ্যোগ করিল। গমনকালে হেমচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, “গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষু হাসিতেছে। আজি, কি তোমার গান শুনিয়া কেহ কিছু বলিয়াছে?”

গি। কে কি বলবে? এক মাগী তাড়া করিয়া মারিতে আসিয়াছিল—বলে মথুরাবাসিনীর জন্তে শ্রাম-সুন্দরের ত মাথাব্যথা পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অক্ষুটস্বরে, যেন আপনা আপনি কহিতে, লাগিলেন, “এত যত্নেও যদি সন্ধান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশা—কেন মিছা কালক্ষেপ করিয়া আত্মকর্ম নষ্ট করি;—গিরিজায়া, কালি তোমাদিগের নগর হইতে বিদায় হইব।”

“তথাস্তু” বলিয়া, গিরিজায়া মৃদু মৃদু গান করিতে লাগিল,—

• “শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা রে।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “ও গান এই পর্য্যন্ত। ঈশ্বর গীত গাও।”

গিরিজায়া গাইল,

“যে ফুল ফুটিত সুধি, গৃহতকশাখে,
কেন রে পবনা, উড়ালি তাকে ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার অন্ত
হঃখ কি ? ভাল গীত গাও ।”

গিরিজায়া গায়িল,

“কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃগাল অধমে ।
জলে তাবে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ॥”

‘হেম । ‘কি, কি.? মৃগাল কি ?’

গি । কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃগাল অধমে ।

জলে তাবে ডুবাইল, পীড়িয়া মরমে ॥
রাজহংস দেখি এক নযনবঙ্গন ।
চরণ বেড়িয়া তাতে করিল বন্ধন ॥

না—অন্য গান গাই ।

হে । না—না—না—এই গান—এই গান গাও
সুমি রাক্ষসী ।

গি । বলে হংসবাজ কাথা কারবে গমন
হৃদয়কমলে দিব তোমার আসন ।
আসিয়া বসিল হংস হৃদয় কমলে ।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃগালিনী জলে ॥

হে । গিরিজায়া ! গিরি—এ গীত তোমাকে কে
শিখাইল ?

গি। (সহাস্র)

হেন কালে কালমেঘ উঠিল আকাশে ।
উডিল মবালরাজ মানস, বিলাসে ॥
ভাঙ্গিল হৃদযপদ্ম তার বেগভরে ।
ডুবিয়া অতলজলে মৃগালিনী মরে ।

হেমচন্দ্র বাম্পাকুললোচনে, গদগদস্বরে গিবিজায়াকে
কহিলেন, “এ আশাবই মৃগালিনী। তুমি তাকে
কোথায় দেখিলে?”

গি। দেখিলাম সবোববে, কাঁপিছে পবনভরে,

মৃগাল উপবে মৃগালিনী।

হে। এখন কর্পক বাথ, আমার কথার উত্তর দাও—
কোথায় মৃগালিনী?

গি। এই মগবে।

হেমচন্দ্র ক্রষ্টভাবে কহিলেন, “তা ত আমি অনেক
দিন জানি। এ নগরে কোন্ স্থানে?”

গি। হৃষীকেশ শর্ম্মাব বাড়ী।

হে। কি পাপ! সে কথা আমিই তোমাকে বলিয়া
দিয়াছিলাম। এত দিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার
নাই, এখন কি সন্ধান করিয়াছ?

গি। সন্ধান করিয়াছি।

হেমচন্দ্র দুই বিন্দু—দুই বিন্দু মাত্র অশ্রুমোচন করিলেন । পুনরপি কহিলেন, “সে এখান হইতে কত দূর ?”

গি । অনেক দূর ।

হে । এখান হইতে কোন দিকে যাইতে হয় ?

হে । এখান হইতে দক্ষিণ, তার পর পূর্ব, তাব পর উত্তর, তার পর পশ্চিম—

হেমচন্দ্র হস্ত মুষ্টিবদ্ধ কবিলেন । কহিলেন, “এ সময়ে তামাসা রাখ—নহিলে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব ।”

গি । শাস্ত হউন । পথ বলিয়া দিলে কি আপনি চিনিতে পারিবেন ?” যদি তা না পারিবেন, তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ? আজ্ঞা করিলে আমি সঙ্গে কবিয়া লইয়া যাইব ।

মেঘমুক্ত সূর্য্যের ঞায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল । তিনি কহিলেন,

“তোমার সর্বকামনা সিদ্ধ হউক—মৃগালিনী কি বলিল ?”

গি । তা ত বলিয়াছি ।—

“ডুবিয়া অতল জলে মৃগালিনী মরে ।”

হে । মৃগালিনী কেমন আছে ?

গি । দেখিলাম শরীরে কোন স্পীড়া নাই ।

হে । সুখে আছে কি ক্লেশে আছে—কি বুঝিলে ?

• গি । শরীরে গহনা, পরণে, ভাল কাপড়—হৃষীকেশ
ব্রাহ্মণের কণ্ঠার সইন

হে । তুমি অধঃপাতে যাও ; মনের কথা কিছু
বুঝিলে ?

গি । বর্ষাকালের পদ্মের মত ; মুখখানি কেবল জলে
ভাসিতেছে ।

হে । পরগৃহে কি ভাবে আছে ?

গি । এই অশোক ফুলের স্তবকের মত । আপনার
গৌরবে আপনি নম্র ।

হে । গিরিজাম্বা ! তুমি বয়সে বালিকা মাত্র ।
তোমার ঞ্চায় বালিকা আর দেখি নাই ।

গি । মাথা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত পাত্রও এমন, আর
দেখেন নাই ।

হে । সে অপরাধ লইও না । মৃগালিনী আর কি
বলিল ?

গি । যো দিন জানকী—

হে । আবার ?

গি । যো দিন, জানকী, রঘুবীর, নিরখি—

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ কবিলেন । তখন সে
কহিল, “ছাড়! ছাড়! বলি! বলি!”

“বল” বলিয়া হেমচন্দ্র কেশ ত্যাগ কবিলেন ।

তখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত ‘মৃগালিনীর সহিত
কথোপকথন বিবৃত কবিল । পবে কহিল,

“মহাশয় আপনি যদি মৃগালিনীকে দেখিতে চান, তবে
আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা কবিবেন ।”

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ
নিঃশব্দে অশোকতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ।
বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করি-
লেন । এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিবি-
জায়ার হস্তে দিলেন, এবং কহিলেন,

“মৃগালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার
নাই । তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে । কহিবে, দেবতা
প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বংসবেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে ।
মৃগালিনী কি বলেন, ‘আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়া
যাইও ।’”

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তিতান্তঃ-
করণে অশোকবৃক্ষতলে তৃণশযায় শয়ন করিয়া রহি-

লেন। ভূজোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া, শয়ান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে, সহস্রা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কঠিন করস্পর্শ হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “বৎস! গাত্ৰোথান কর। আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—সন্তুষ্টও হইয়াছি। তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় কেন চাহিয়া বহিয়াছ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন?”

মাধবাচার্য্য একথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগিলেন,

“তুমি এ পর্য্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া পথে বিলম্ব করিতেছ—ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তুমি যে মৃগালিনীর সন্ধানে পাইয়াও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্ত তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ উপেক্ষা করিলে, এজন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে কোন তিরস্কার করিব না। কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। মৃগালিনীর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করা হইবে না। বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। আমি

আজি নবদ্বীপে যাত্রা করিব । তোমাকে আমার সঙ্গে
যাইতে হইবে—নৌকা প্রস্তুত আছে । অস্ত্র শস্ত্রাদি
গৃহমধ্য হইতে লইয়া আইস । আমার সঙ্গে চল ।”

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন । ‘হান
নাই—আমি আশা ভরসা বিসর্জন করিয়াছি । চলুন ।
কিন্তু আপনি—কামচর না অন্তর্ধার্মী ?’

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ পূর্বক
বণিকের নিকট বিদ্যায় গ্রহণ করিলেন । এবং আপনাব
সম্পত্তি একজন বাহকের স্কন্ধে দিয়া আচার্য্যের অনুবর্তী
হইতে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

লুক ।

মৃগালিনী বা গিরিজায়া এতন্মধ্যে কেহই আত্মপ্রতিশ্রুতি
বিস্মৃতা হইলেন না । উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হৃষীকেশের
গৃহপার্শ্বে সম্মিলিত হইলেন । মৃগালিনী গিরিজায়াকে
দেখিবামাত্র কহিলেন,

“কই, হেমচন্দ্র কোথায় ?”

গিরিজায়া কহিল “তিনি আইসেন নাই ।”

“আইসেন নাই !” এই কথাটি মৃগালিনীর, অন্তস্তুল হইতে ধ্বনিত হইল। কণেক উভয়ে নীরব। তৎপবে মৃগালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন আসিলেন না ?”

গি। তাহা আমি জানি না। এই পত্র দিয়াছেন।

এই বলিয়া গিবিজায়া তাহার হস্তে পত্র দিল। মৃগালিনী কহিলেন, “কি প্রকাবেই বা পড়ি। গৃহে গিয়া প্রদীপ জালিয়া পড়িলে মণিমালিনী উঠিবে।”

গিবিজায়া কহিল, “অধীবা হইও না। আমি প্রদীপ, তেল, চকমকি, সোলা সকলই আনিয়া বাথিয়াছি। এখনই আলো কবিতেছি।”

গিরিজায়া শীঘ্রহস্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ জ্বালিত কবিল। অগ্ন্যুৎপাদনশব্দ একজন গৃহবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল—দ্বীপালোক সে দেখিতে পাইল।

গিবিজায়া দীপ জ্বালিত করিলে মৃগালিনী নিম্নলিখিত মত মনে মনে পাঠ কবিলেন।

“মৃগালিনি ! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব ? তুমি আমার জন্ম দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবানুগ্রহে তোমার

সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি-
লাম না। তুমি ইহাতে আমাকে অপ্ৰণয়ী মনে করিবে—
অথবা অশ্রু হইলে মনে করিত—তুমি করিবে না।
আমি কোন বিশেষ ব্রতে নিযুক্ত আছি—যদি তৎপ্রতি
অবহেলা করি, তবে আমি কুলান্তর। তৎসাধন জন্ত
আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমাব
সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। আমি নিশ্চিত জানি
যে, আমি যে তোমার জন্ত সত্যভঙ্গ করিব, তোমাবও
এমন সাধ নহে। অতএব এক বৎসর কোন ক্রমে দিন
যাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে, তবে অচিরাৎ
তোমাকে রাজপুরবধু করিয়া আত্মস্থ সম্পূর্ণ করিব।
এই অন্নবয়স্কা ঐগল্ভবুদ্ধি বালিকাহস্তে উত্তর প্রেরণ
করিও।” মৃগালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন,

“গিরিজায়া! আমাব পাতা লেখনী কিছুই নাই যে
উত্তর লিখি। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও।
তুমি বিশ্বাসী, পুরস্কার স্বরূপ আমার অশ্রের অলঙ্কার
দিতেছি।”

গিরিজায়া কহিল, “উত্তর কাহার নিকট লইয়া
ধাইব? তিনি আমাকে পত্র দিয়া বিদায় করিবার সময়
বলিয়া দিয়াছিলেন যে, “স্বামী রাতেই আমাকে প্রত্যুত্তর

আনিয়া দিও।”• আমিও স্বীকার কবিয়াছিলাম। আমি-
বাব সময় মনে কবিলাম, হয ত তোমার নিকট লিখিবার
সীমগ্রী কিছুই নাই, এজন্য সে সকল যোটপাট কবিয়া
আনিবার• জন্য তাঁহাব উদ্দেশে, গেলাম। তাঁহাব
সাক্ষাৎ পাইলাম না, শুনিলাম, তিনি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপ
যাত্রা কবিয়াছেন।”

মৃ। নবদ্বীপ ?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। সন্ধ্যাকালেই ?

গি। সন্ধ্যাকালেই।• শুনিলাম তাঁহাব গুরু আসিয়া
তাঁহাকে সঙ্গে কবিয়া লইয়া গিয়াছেন।

মৃ। মাধবাচার্য্য। মাধবাচার্য্যই আগার কাল।

পবে অনেকক্ষণ চিন্তা কবিয়া মৃণালিনী কহিলেন,
“গিরিজায়া, তুমি বিদায় হও। আর আমি ঘবের কাহিবে
থাকিব না।”

গিরিজায়া কহিল, “আমি চলিলাম” এই বলিয়া
গিরিজায়া বিদায় হইল। তাঁহার মৃহ মৃহ গীতধ্বনি
শুনিত্তে শুনিত্তে মৃণালিনী গৃহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

মৃণালিনী বাটায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন দ্বার রুদ্ধ
করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে

কে আসিয়া তাঁহার 'হাত ধাবল। মৃগালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী कहিল,

“তবে সাধি ! এইবার জালে পড়িয়াছ। অনুগৃহীত ব্যক্তিটা কে গুণিতে পাই না ?”

মৃগালিনী তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া कहিলেন,
“ব্যোমকেশ ! ব্রাহ্মণকুলে পাষণ্ড ! হাত ছাড়।”

ব্যোমকেশ হৃষীকেশের পুত্র। এ ব্যক্তি ঘোব মূর্খ এবং দুশ্চরিত্র। সে মৃগালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং স্বাভিলাষ পূর্ব্বের অগ্র কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বলপ্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু মৃগালিনী মণিমালিনীর সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতেন না, এ অগ্র ব্যোমকেশ এ পর্য্যন্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

মৃগালিনীর ভৎসনার ব্যোমকেশ कहিল, “কেন হাত ছাড়িল ? হাতছাড়া কি করতে আছে ? ছাড়াছাড়িতে কাজ কি, ভাই ? একটা মনের দুঃখ বলি, 'আমি কি মনুষ্য' নই ? যদি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না ?”

মৃ। কুলাঙ্গার ! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই ডাকিয়া গৃহস্থ সকলকে উঠাইব।

ব্যো। উঠাও। আমি कहিব অভিসারিকাকে ধরিয়াছি।

মৃ। তবে অধঃপাতে যাও। এই বলিয়া মৃগালিনী সবলে হস্তমোচন জন্তু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পাবিলেন না। ব্যোমকেশ কহিল, “অধীর হইও না। আমার মনোরথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ কবিব। এখন তোমাব সেই, ভগিনী মৃগালিনী কোথায়?”

মৃ। আমিই তোমার ভগিনী।

ব্যো। তুমি আমার সম্বন্ধীর, ভগিনী—আমার ব্রাহ্মণীভ ভেয়ের ভগিনী—আমার প্রাণাধিকা রাধিকা! সর্বার্থসাধিকা।

এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃগালিনীকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যখন মাধবাচার্য্য তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, তখন মৃগালিনী স্ত্রীস্বভাবসুলভ চীৎকারে রতি দেখান নাই, এখনও শব্দ করিলেন না।

কিন্তু মৃগালিনী আর সহ করিতে পারিলেন না। মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন। ব্যোমকেশ লাথি খাইয়া বলিল,

“ভাল ভাল, ধন্য হইলাম! ও চরণস্পর্শে মৌক্ষপদ পাইব। সুন্দরী! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ।”

পশ্চাৎ হইতে ফে বলিল, “আব, আমি তোমার
অর্জুন

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাঙ্ক্ষরস্বরে বিকট চীৎকার
করিয়া উঠিল। “বাক্সি। তোমার দৃষ্টি কি বিষ আছে?”
এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃগালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া
আপন পৃষ্ঠে হস্তমার্জন করিতে লাগিল। স্পর্শানুভবে
জানিল যে পৃষ্ঠ দিয়া দরদরিৎ ক্রোধ পড়িতেছে।

মৃগালিনী মুক্তহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও
প্রথমে ব্যোমকেশের স্তায় বিস্মিতা হইয়াছিলেন, কেন
না, তিনি ত ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। ভল্লুকো-
চিত কার্য তাঁহাব করণীয় নহে। কিন্তু তখনই
নক্ষত্রালোকে খর্ষাকৃতা বালিকামূর্তি সম্মুখ হইতে অপ-
সৃত হইতেছে দেখিতে পাইলেন। গিরিজায়া তাঁহাব
বসনাকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে, “পলাইয়া আইস” বলিয়া
স্বয়ং পলায়ন করিল।

পলায়ন মৃগালিনীর স্বভাবসঙ্গত নহে। তিনি পলায়ন
করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর্তনাদ
করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া, তিনি
গজেন্দ্রগমনে নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু
তৎকালে ব্যোমকেশের আর্তনাদে গৃহস্থ সকলেই

জাগবিত হইয়াছিল । সম্মুখে স্বধীকেশ । স্বধীকেশ
পুলকে শশব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কি হইয়াছে ? কেন ষাঁড়ের মত চীৎকার করি-
তেছ ?”

ব্যোমকেশ কহিল, “মৃগালিনী অভিভাবে গমন
করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে
আমাব পৃষ্ঠে দারুণ দংশন করিয়াছে ।”

স্বধীকেশ পুত্রের কুবীতি কিছুই জানিতেন না ।
মৃগালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথা
তাঁহার বিশ্বাস হইল । তৎকালে তিনি মৃগালিনীকে
কিছুই বলিলেন না । নিঃশব্দে গঙ্গামিনীর পশ্চাৎ
তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—:::—

স্বধীকেশ ।

মৃগালিনী সন্ধ্যে সন্ধ্যে তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া
স্বধীকেশ কহিলেন,

“মৃগালিনি ! তোমাব এ কি চরিত্র ?”

মৃ। আমাব কি চরিত্র ?

স্ব। তুমি কাব মেয়ে, কি চরিত্র কিছুই জানি না, গুরুর অনুবোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছি। তুমি আমাব মেয়ে, মণিমালিনার সঙ্গে এক বিছানায় শোও—তোমাব কুলটাবৃত্তি কেন ?

মৃ। আমাব কুলটাবৃত্তি যে বলে সে মিথ্যাবাদী।

‘ঈর্ষাকেশেব ক্রোধে অধঃ কম্পিত হইল। কহিলেন, “কি পাপীষসি।” আমার অন্তে উদব পূরাবি, আব আমাকে দুর্ভাক্য বলিবি ? তুই আমাব গৃহ হইতে দূর হ। না হয় মাধবাচার্য্য রাগ কবিবেন, তা বলিয়া এমন কালসাপ ঘবে বাখিতে পারিব না।”

মৃ। যে আজ্ঞা—কালি প্রাতে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।

ঈর্ষাকেশেব বোধ ছিল যে, যে কালে তাহার গৃহ-বহিষ্কৃত হইলেই মৃগালিনী আশ্রয়হীনা হয়, সেকালে এমন উত্তর তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু মৃগালিনী নিবাস্রয়ের আশঙ্কায় কিছুমাত্র ভীতি নহেন দেখিয়া মনে করিলেন যে, তিনি জাবগৃহে স্থান পাইবার ভরসাতেই একপ উত্তর করিলেন। ইহাতে ঈর্ষাকেশেব কোপ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন,

“কালি প্ৰাতে ! আজই দূৰ হও ।”

মৃ। যে আজ্ঞা। আমি সখী মণিমালিনীৰ নিকট
বিদায় হইয়া আজই দূৰ হইতেছি ।

এই বলিয়া মৃগালিনী গাত্ৰোত্থান করিলেন ।

স্বৰীকেশ কহিলেন, “মণিমালিনীৰ সহিত কুলটার
আলাপ কি ?”

এবার মৃগালিনীৰ চক্ষে জল আসিল । কহিলেন,
“তাহাই হইবে । আমি কিছুই লইয়া আসি নাই ; কিছুই
লইয়া যাইব না । একবসনে চলিলাম । আপনাকে
শ্ৰণাম হই ।”

এই বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মৃগালিনী
শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চলিলেন ।

যেমন অশ্রুত গৃহবাসীরা ব্যোমকেশের আৰ্ত্তনাদে
শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন, মণিমালিনীও তদ্রূপ
উঠিয়াছিলেন । মৃগালিনীৰ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা
শয্যাগৃহ পৰ্য্যন্ত আসিলেন দেখিয়া, তিনি এই অবসরে
ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন ; এবং ভ্রাতার
দুঃস্বপ্ন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিতে
ছিলেন । যখন তিনি ভৎসনা সমাপন করিয়া প্ৰত্যাগমন
করেন, তখন প্ৰাঙ্গণভূমে, দ্রুতপাদবিক্ষেপিনী মৃগা-

লিনীকে সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । তিনি হিঙ্কাসা
'কবিলেন,

“সই অমন কবিয়া এত বাক্তে কোথায় যাইতেছ ?”

মৃগালিনী কহিলেন, “সখি; মণিমালিনী, তুমি
'চিরায়ুয়তী হও । আমাব সহিত আলাপ করিও না—
তোমাব বাপ মানা কবেছেন ।”

মণি । সে কি মৃগালিনী ! তুমি কাঁদিতেছ কেন ?
সর্বনাশ ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন !
সখি, ফেব । রাগ কবিও না ।

মণিমালিনী মৃগালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না ।
পৰ্বতসানুবাহী শিলাখণ্ডে গিয়া অভিধানিনী সাধবী চলিয়া
গেলেন । তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী পিতৃসন্নিধানে
আসিলেন । মৃগালিনীও গৃহের বাহিরে ছাড়িলেন ।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূৰ্বসঙ্কেত স্থানে গিবি-
জায়া দাঁড়াইয়া আছে । মৃগালিনী তাহাকে দেখিয়া
কহিলেন

• “তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন ?”

গিবি আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসি-
লাম । তুমি আইস না আইস—দেখিয়া যাইবার জন্য
দাঁড়াইয়া আছি ।

মৃ। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে ?

গি। তা ক্ষতি কি ? বামুন বৈ ত গরু নয় ?

মৃ। কিন্তু তুমি যে গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম ?

গি। তাব পর তোমাদের কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। দেখে মনে হলো, মিন্সে আমাকে একদিন “কালী পিপড়ে” বলে ঠাট্টা কবেছিল। সে দিন হল ফুটানটা বাকি ছিল। সুযোগ পেয়ে বামুনেব ঋণ শোধ দিলাম। এখন তুমি কোথা বাইবে ?

মৃ। তোমাব ঘরদ্বার আছে ?

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে।

মৃ। সেখানে আব কে থাকে ?

গি। এক বুড়ী মাত্র। তাহাকে আয়ি বলি।

মৃ। চল, তোমার ঘবে যাব।

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম।

এই বলিয়া দুইজনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরি-জায়া কহিল, “কিন্তু সে ত কুঁড়ে। সেখানে কয় দিন থাকিবে ?”

মৃ। কালি প্রাতে অশ্রুত যাইব।

গি । কোথা ? মথুবার ?

মৃ । মথুবার আমার আর স্থান নাই ।

গি । তবে কোথায় ?

মৃ । যমালয় ।

এই কথার পর দুই জনে ক্রমে কাল চূপ করিয়া রহিল । তার পর মৃগালিনী বলিল, “এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় ?”

গি । বিশ্বাস হইবে না কেন ? কিন্তু সে স্থান ত আছেই, যখন ইচ্ছা তখনই যাইতে পারিবে । এখন কেন আর এক স্থানে যাও না ?

মৃ । কোথা ?

গি । নবদ্বীপ ।

মৃ । গিরিজায়া, তুমি ভিখারিণী বেশে কোন মায়া-বিনী । তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না । বিশেষ তুমি হিতৈষী । নবদ্বীপেই যাইব স্থির করিয়াছি ।

গি । একা যাইবে ?

মৃ । সঙ্গী কোথায় পাইব ?

গি । (গায়িতে গায়িতে)

“মেঘ দরশনে হার, চাতকিনী ধায় রে ।

সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আর আয় আয় রে ॥

মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিবিজায় যাব রে ॥

মৃ। এ কি রহস্য, গিরিজায় ?

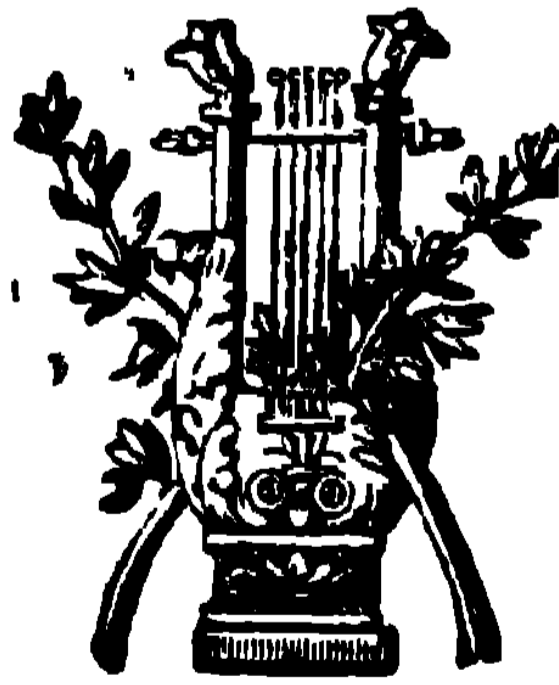
গি। আমি যাব ।

মৃ। সত্য সত্যই ?

গি। সত্য সত্যই যাব

মৃ। কেন যাবে ?

গি। আমার সর্বত্র সমান । রাজধানীতে ভিক্ষা
বিস্তর ।



দ্বিতীয় খণ্ড ।

— ০০ —



দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

.গোডেশ্বর ।

অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জলকাবী বাজ্রাধি-
রাজ গোডেশ্বর বিধাজ করিতেছেন । উচ্চ শ্বেত
প্রস্তরের বেদির উপবে বহুপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে,
বহুপ্রবালমণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীয়ান বাজ্রা বসিয়া আছেন ।
শিরোপরি কনককিঙ্কিনী-সংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্য-
গচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে । এক দিকে
পৃথগাসনে 'হোয়াবশেষবিভূষিত, অনিন্দ্যমূর্তি ব্রাহ্মণ

মণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পবিত্রকবিতা কবিয়া বসিয়া
 আছেন। যে আসনে, একদিন হলায়ুধ উপবেশন
 কবিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপবিদ্যামদণী
 চাট্ঠিকাব অধিষ্ঠান কবিতেছিলেন। অতীতকালে মহামাতা
 ধর্ম্মাধিকারকে অগ্রবর্তী কবিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপ
 বেশন কবিয়াছিলেন। মহাপ্রাণমন্ত, মহাকুমারামাতা,
 প্রমাতা, ঔপরিিক, দাসাদর্শনিক, চৌবোদ্ধবণিক, শৌনিক,
 গৌনিকগণ, কাব্রুপ, প্রান্তপালেরা, কোটপালেরা, বাণ্ড
 রিকা, তদায়ুক্তক, বিনিয়ুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন
 কবিতেছেন। মহাপ্রতিপত্তি সূত্রের সভাব অসাধারণতা
 রক্ষা কবিতেছেন। স্থাবকেবা উভয়পার্শ্বে শ্রেণীক
 হইয়া 'দাডাইয়া' আছে। সর্বজন হইতে পৃথগাসনে
 কুশাসনমাত্র গ্রহণ কবিয়া পাণ্ডিত্যব মাধবাচার্য্য উপবেশন
 করিয়া আছেন।

• রাজসভাব নিয়মিত কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে, সভা-
 ভঞ্জে উত্তোগ হইল। তখন মাধবাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন
 কবিয়া কহিলেন, "মহাবাজ। ব্রাহ্মণের বাচস্পতি মাজ্জনা
 কবিবেন। আপনি বাজ্ঞনীতিবিশাবদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলে
 যত বাজগণ আছেন সর্বাপেক্ষা বহুদর্শী, প্রজাপালক,
 আপনিই আজন্ম রাজা। আপনার অবিদিত নাই যে

শত্রুদমন রাজার প্রধান কর্ম্ম । আপনি প্রবল শত্রু
দমনেব কি উপায় কবিয়াছেন ?”

রাজা কহিলেন, “কি আক্রমণ করিতেছেন ?” সকল কথা
বর্ষায়ান রাজার শ্রুতিমূলভ হয় নাই ।

মাধবাচার্য্যের পুনর্কৃত্তিব প্রতীক্ষা না কবিয়া ধর্ম্মা-
ধিকার পশুপাত কহিলেন, “মহাবাজাধিবাজ । মাধবাচার্য্য
রাজসমীপে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রুদমনেব কি
উপায় হইয়াছে । বন্ধেশ্ববেব কোন্ শত্রু এ পর্য্যন্ত দমিত
হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য্য ব্যক্ত কবেন নাই । তিনি
সম্বিশেষ বাচন ককন ।”

মাধবাচার্য্য অল্প হাস্য কবিয়া এবাব অচূচ্চস্ববে
কহিলেন, “মহাবাজ, তুরকীয়েবা আর্থাবত্ত প্রায় সমদয
হস্তগত কবিয়াছে । আপাততঃ তাহাবা মগধ জয় কবিয়া
গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে ।”

এবাব কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল । তিনি
কহিলেন, “তুরকীদিগেব কথা বলিতেছেন ? তুরকীয়েবা
কি আসিয়াছে ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “ঈশ্বর বক্ষা কবিতেছেন ;
এখনও তাহাবা এখানে আসে নাই । কিন্তু আসিলে
আপনি কি প্রকারে তাহাদিগেব নিবারণ করিবেন ?”

রাজা কহিলেন, “আমি কি করিব—আমি কি করিব ? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আসুক।”

এবস্থত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকাবণ ঈর্ষৎ ঝনৎকার শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচার্য্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, “আচার্য্য, আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন ? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে অবশ্য ঘটিবে—কাহারি সাধ্য নিবারণ করে ? তবে যুদ্ধোত্তমে প্রয়োজন কি ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “ভাল সভাপণ্ডিত মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতদুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন ?”

দামোদর কহিলেন, “বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা—”

মাধ। ‘যথা’ থাকুক—“বিষ্ণুপুরাণে আনিতে অনুমতি কখন ; দেখান এরূপ উক্তি কোথায় আছে ?”

দামো । আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম ? ভাল স্বরণ করিয়া দেখুন দেখি, মনুতে এ কথা আছে কি না ?

মাধ । গোড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানবধর্মশাস্ত্রেরও কি পারদর্শী নহেন ?

দামো । কি জ্বালা ! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন । আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হইলেন, আমি কোন্ ছার ? আপনার সম্মুখে গ্রহের নাম স্বরণ হইবে না ; কিন্তু কবিতাটা শ্রবণ করুন ।

মাধ । গোড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত যে অনুষ্টুপ্ছন্দে একটি কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে । কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—তুরকজাতীয় কর্তৃক গোড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই ।

পণ্ডিত কহিলেন, “আপনি কি সর্বশাস্ত্রবিৎ ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করুন ?”

সভাপণ্ডিতের একজন পারিষদ কহিলেন, “আমি কবি । আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ । যে আত্মশ্লাঘাপরবশে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “মূর্খ তিন জন । যে আত্ম-

রক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর
যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারা ই
মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ।”

সভাপণ্ডিতের পারিষদ অধোবদনে উপবেশন করি-
লেন।

পশুপতি কহিলেন, “যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ
করিব।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “সাধু! সাধু! আপনাব যেরূপ
যশঃ, সেইরূপ প্রস্তাব কবিলেন। জগদীশ্বর আপনাকে
কুশলী করুন! আগার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, যদি যুদ্ধই
ঘটিতপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে?”

পশুপতি কহিলেন, “মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য। এ
সভাতলে প্রকাশ্য নহে। কিন্তু যে অশ্ব, পদাতি এবং
নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী
পর্য্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবে।”

‘মা। কতক কতক জানিয়াছি।

প। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন?

মা। প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, এক বীরপুরুষ
এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ
হেমচন্দ্রের বীর্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন।

প। বিশেষ শুনিয়াছি । • ইহাও শ্রুত আছি, যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য । আপনি বলিতে পারিবেন যে, ঐদৃশ বীৰপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে ।

মা। যখনবিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন । এই মাত্র কাবণ ।

প। তিনি কি এক্ষণে অবস্থীপে আগমন কবিয়াছেন ?

মা। আসিয়াছেন । রাজ্যাপহারক যখন এই দেশে আগমন কবিতোছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম কবিয়া দম্ভ্য ব দণ্ডবিধান কবিবেন । গৌড়বাজ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া উভয়ে শত্রুবিনাশের চেষ্টা কবিলে উভয়েই মঙ্গল ।

প। রাজবল্লভেবা অগুই তাঁহার পবিচর্যায় নিযুক্ত হইবে । তাঁহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নিদিষ্ট হইবে । সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থিব হইবে ।

পরে বাজাজায় সভাভঙ্গ হইল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—:~:—

কুম্মনির্মিতা ।

উপনগর প্রান্তে, গঙ্গাতীরবর্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থ রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট করিলেন । হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের পবামশানুসারে সুবন্দ্য অট্টালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন ।

নবদ্বীপে জনার্দিন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি বয়োবাহুল্য প্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের হানিপ্রযুক্ত সর্বতোভাবে অসমর্থ ৮ অথচ নিঃসহায় । তাঁহার সহধর্ম্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা । কিছুদিন হইল, ইহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাত্মায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল । সেই অবধি ইহারা আশ্রয়ভাবে এই বৃহৎ পুর্বীক এক পার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন । এক্ষণে কোন রাজপুরুষ আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া তাঁহারা পবাধিকার ত্যাগ করিয়া বাসান্তর্বের অন্তেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন ।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন । বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান

হইতে পারে । ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন । হেম-
চন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, “ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ
করিতে নিবারণ কর ।” ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল,
“এ কার্য্য ভৃত্য দ্বারা সম্ভবে না । ব্রাহ্মণঠাকুর আমার
কথা কাণে তুলেন না ।”

ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না—
কেন না তিনি বধির । হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভি-
মান প্রযুক্ত ভৃত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না । একান্ত
স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন । ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন ।

জনাদ্দন আশীর্বাদ কবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি কে ?”

হে । আমি আপনাব ভৃত্য ।

জ । কি বলিলে—তোমার নাম বামকৃষ্ণ ?

হেমচন্দ্র অনুভব কবিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড়
প্রবল নহে ! অতএব উচ্চতবস্ববে কহিলেন, “আমার
নাম হেমচন্দ্র । আমি ব্রাহ্মণের দাস ।”

জ । ভাল ভাল ; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই,
তোমাব নাম হনুমান দাস ।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, “নামের কথা দূর হউক ।
কার্য্যসাধন হইলেই হইল ।” বলিলেন, “নবদ্বীপাধি-

পরিব এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জগু
নিযুক্ত কবিয়াছেন। শুনিলাম আমার আসায় আপনি
স্থান ত্যাগ কবিতেন।”

জ। না, এখনও গঙ্গামানে তাই নাই; এই স্থানের
উদ্যোগ কবিতেন।

হে। (অত্যাচেষ্টেঃস্ববে) স্থান যথাসময়ে করিবেন।
এক্ষণে আমি এই অনুবোধ কবিতেন আসিয়াছি, যে
আপনি এ গৃহ-ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না? তোমার বাটীতে
কি? আদ্য শ্রদ্ধ?

হে। ভাল; আহাৰাদিব অভিযোগ করেন, তাহাবও
উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে যেকপ এ বাড়ীতে অবস্থিতি
কবিতেন সেইকপই করুন।

জ। ভাল ভাল; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা
ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী
কোথা?

হেমচন্দ্র হতাশাস হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন,
এমন সময়ে পশ্চাৎ হঠাৎ কে তাঁহাব উত্তরীয় ধবিয়া
টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম
মুহূর্তে তাঁহার বোধ হইল সম্মুখে একখানি কুমুমনির্মিতা

দেবীপ্রতিমা । দ্বিতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব ;
তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্মাণ-
কৌশল সীমা-কপিণী বালিকা অথবা পূর্ণমৌবনা তরুণী ।

বালিকা না তরুণী ? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া
নিশ্চিত কবিত্তে পাবিলেন না ।

বীণানিন্দিতম্বরে সুন্দরী কহিলেন, “তুমি পিতামহকে
কি বলিতেছিলে ? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন
কেন ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম ।
তুমি কে ?”

বালিকা বলিল, “আমি মনোরমা ।”

হে । ইনি তোমাব পিতামহ ?

মনো । তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ?

হে । শুনিলাম ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার
উদ্যোগ করিতেছেন, আমি তাই নিবারণ করিতে
আসিয়াছি ।

‘ম । এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন । তিনি
আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন ?

হে । আমিই সেই রাজপুত্র । আমি তোমাদিগকে
অনুরোধ কবিত্তেছি, তোমরা এখানে থাক ।

ম। কেন ?

এ 'কেন'র উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অণ্ড উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "কেন ? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত ?"

ম। তুমি কি আমার ভাই ?

হে। আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে ?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না, ত ?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা ? না উন্মাদিনী ?" কহিলেন, "কেন তিরস্কার করিব ?"

ম। যদি আমি দোষ কবি ?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে ?

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাৱে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, "আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয় ?"

হে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে ?

‘হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, “আমাব . বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি ?”

ম। আমি বলিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা মূহ মূহ স্বরে জনার্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে মনোরমার সেই মূহ কথা বধিরের বোধগম্য হইল।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। এবং কহিলেন, “মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার ন্যূতি হইলেন—আশীর্বাদ করুন।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং “ব্রাহ্মণি ! ব্রাহ্মণি !” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্যে ব্যাপ্তা ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ। কাণে কম শোনে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

নৌকাঘানে ।

হেমচন্দ্র ত উপবনগৃহে সংস্থাপিত হইলেন । আব
মৃগালিনী ? নির্ঝাসিতা, পৰপৌড়িতা, সহায়হানা মৃগালিনী
কোথায় ?

সান্ধ্যগগনে বক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ কবিয়া
ক্রমে ক্রমে ক্লম্ববর্ণ ধাবণ কবিল । বজনোদত্ত তিমিরাববণে
গঙ্গাব বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল । সভানগুলো
পরিচাখকহস্তজ্বালিত দীপমালাব গায়, অথবা প্রভাতে
উদ্যানকুমুমসমূহের গায়, আকাশে নক্ষত্রগণ কুটিতে
লাগিল । প্রায়ান্নকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীবণ কিঞ্চিৎ
খরতরবেগে বহিতে লাগিল । তাহাতে রমণীহৃদয়ে
নাথকসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের গায় নদীফেনপুঞ্জ
শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল । বহুলোকের
কোলাহলের গায় বীচিরব উখিত হইল । নাবিকেরা নৌকা
সকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জ্য বিশ্রামের ব্যবস্থা
করিতে লাগিল । তন্মধ্যে একখানি ছোট ডিম্বী অগ্ন

নোকা হইতে পৃথক্ এক খালেখ মুখে লাগিল । ন্যাবি
কেবা আহাবাদিব ব্যবস্থা কবিত্তে লাগিল ।

ক্ষুদ্র ভবনীতে দুইটিমাত্র আবোহা । দুইটিই স্ত্রীলোক ।
পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃগালিনী আব
গিবিজায়া ।

গিবিজায়া মৃগালিনীকে সম্বোধন কবিয়া কহিল,
“আজিকাব দিন কাটিল ।”

মৃগালিনী কোন উত্তর কবিল না ।

গিবিজায়া পুনরপি কহিল, “কালিকাব দিনও কাটিবে
—পরদিনও কাটিবে—কেন কাটিবে না ?”

মৃগালিনী তথাপি কোন উত্তর কবিলেন না । কেবল
মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবিলেন ।

গিবিজায়া কহিল, “ঠাকুবানি । এ কি এ ? দিবানিশি
চিন্তা কবিয়া কি হইবে ? যদি আমাদিগেব নদীয়
‘আমা কাজ’ ভাল না হইয়া থাকে, চল, এখনও ফিবিয়
যাই ।”

মৃগালিনী এবার উত্তর কবিলেন । বলিলেন, “কোথা
যাইবে ?”

গি । চল স্রীকেশেব বাড়ী যাই ।

মৃ । বরং এই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মবিব

গি । চল তবে মথুরায় যাই ।

মৃ । আমি ত বলিয়াছি তথায় আমার স্থান নাই ।
কুণ্ডার ঞ্চায় 'রাত্ৰিকালে যে বাপের ঘব ছাড়িয়া জাসি-
য়াছি, কি বলিয়া সে বাপের ঘরে আব মুখ দেখাইব ?

গি । কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস নাই, মন্দ
ভাবিয়াও আইস নাই । যাইতে ক্ষতি কি ?

মৃ । সে কথা কে বিশ্বাস করিবে ? যে বাপের ঘবে
আদরের প্রতিমা হিলাম, সে বাপের ঘবে ঘৃণিত হইয়াই
বা কি প্রকারে থাকিব ?

গিরিজায়া অন্ধকারে দোখতে পাইল না যে, মৃগা-
লিনীর চক্ষু হইতে ঝাবিবিবিন্দু পর ঝাবিবিবিন্দু পড়িতে
লাগিল । গিরিজায়া কহিল, "তবে কোথায় যাইবে ?"

মৃ । যেখানে যাইতেছি ।

গি । সে ত সুখের যাত্রা । তবে অন্তমন কেন ?
যাহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি,
ইহার অপেক্ষা সুখ আর কি আছে ?

মৃ । নদীয়ায় আমায় সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ
হইবে না ।

গি । কেন ? তিনি কি সেখানে নাই ?

মৃ । সেইখানেই আছেন । কিন্তু তুমি ত জান যে

আমার সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত । আমি
কি সে ব্রত ভঙ্গ কবাইব ?

গিবিজ্ঞায়া নীবব হইয়া বহিল । মৃণালিনী আবার
কহিলেন, “আব কি” বলিয়াই বা তাঁহার নিকট দাঁড়াইব ?
আমি কি বলিব যে, হুম্বীকেশের উপর রাগ করিয়া আসি-
য়াছি, না, বলিব যে, হুম্বীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া
বিদায় করিয়া দিয়াছে ?”

গিবিজ্ঞায়া ক্ষণেক নীবব থাকিয়া কহিল, “তবে কি
নদীয়ায় তোমাব সঙ্গে হেমচন্দ্রব সাক্ষাৎ হইবে না ?”

মৃ । না ।

গি । তবে যাইতেছ কেন ?

মৃ । তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না । কিন্তু
আমি তাঁহাকে দেখিব । তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি ।

গিবিজ্ঞায়াব মুখে হাসি ধবিল না । বলিল, তবে আমি
গীত গাই,

“চরণতলে দিনু হে গ্রাম পরাণ রতন ।

দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন ॥

এ রতন সমতুল,

ইহা তুমি দিবে মূল,

দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন ॥”

ঠাকুরাণি, তুমি তাঁহাকে দেখিয়া ত জীবনধারণ

কবিবে। আমি তোমাব দাসী হইয়া'ছ, আমার ত
তাহাতে পেট ভরিবে না, আমি কি খেয়ে বাঁচিব ?”

মৃ। আমি ছই একটা শিল্পকর্ম জানি। মালা
গাঁথিতে জানি, চিত্র কবিতে জানি, কাপড়ের উপর ফুল
তুলিতে জানি। তুমি বাজারে আমাব শিল্পকর্ম বিক্রয়
করিয়া দিবে।

গিবি। . আব আমি ঘবে ঘবে গীত গায়িব। “মৃগাল
অধমে” গাইব কি ?

মৃগালিনী অর্দ্ধহাস্য, অর্দ্ধ সঙ্কোপ দৃষ্টিতে গিরিজায়াব
প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

গিবিজায়া কহিল, “অমন কবিয়া চাহিলে আমি গীত
গায়িব।” এই বলিয়া গায়িল,

“সাধেব তবনী আমার, কে দিল তবঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডাবী হেন কে যাউবে সঙ্গে।”

মৃগালিনী ক হল, “যদি এত ভয়, তবে একা এলে
কেন ?”

গিবিজায়া কহিল, “আগে কি জানি। বলিয়া গায়িতে
লাগিল;

“ভানুল তবী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব বঙ্গে।

এখন—গগনে গরজে ঘন, বহে ধব সমীরণ,
কুল তাজি এলাম কেন, মবিতে আতঙ্গে ॥”

মৃগালিনী কহিল, “কুলে ফিরিয়া যাও না কেন ?”

গিবিজ্ঞায়া গায়িতে গাগিল,

“মনে করি কুলে ফিরি, বাহি তবি ধীরি ধীরি,
কুলেতে কটক-তক বেষ্টিত ভুঞ্জয়ে ।”

মৃগালিনী কহিলেন “তবে ডুবিয়া মব না কেন ?”

গিবিজ্ঞায়া কহিল, “মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু”

বলিয়া আবার গায়িল,

“যাহাবে কাণ্ডাবী কবি, সাজাউয়া দিনু তবি,
সে কভু না দিল পদ তবগাব অঙ্গে ॥

মৃগালিনী কহিলেন, “গিবিজ্ঞায়া, এ কোন অশ্রে-
মিকের গান ।”

গি। কেন ?

মৃ। আমি চইলে তবি ডুবাই ।

গি। সাধ কবিয়া ?

মৃ। সাধ কবিয়া ।

গি। তবে তুমি জলের ভিত্ত্ব রত্ন দেখিয়াছ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

বাতায়নে ।

হেমচন্দ্র কিছুদিন উপবনগৃহে বাস করিলেন ।
 জন্মদিনেব সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত, কিন্তু ব্রাহ্মণেব
 বধিবতা প্রযুক্ত ইহিতে আলাপ হইত মাত্র । মনোবমাব
 সহিতও সর্বদা সাক্ষাৎ হইত, মনোবমা কখন তাঁহাব
 সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কখন বা বাক্য-
 ব্যয় না কবিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন । বস্তুতঃ
 মনোবমার প্রকৃতি তাঁহাব পক্ষে অধিবতব বিস্ময়জনক
 বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তাঁহাব বয়ঃক্রম
 ছবনুয়েয়, সহজে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত,
 কিন্তু কখন কখন মনোরমাকে অতিশয় গাম্ভীর্যশালিনী
 দেখিতেন । মনোবমা কি অগাপি কুমারী ? হেমচন্দ্র
 একদিন কথোপকথনচ্ছলে মনোবমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
 “মনোরমা, তোমাব শব্দববাড়ী কোথা ?” মনোবমা
 কহিল, “বলিতে পারি না !” আর একদিন জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন, “মনোরমা, তুমি কয় বৎসরের হইয়াছ ?”

মনোরমা তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, “বলিতে পারি না।”

মধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত কবিয়া দেশ-পর্যটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহাব' অভিপ্রায় এই যে, এ সময় গোড়দেশীয় অধীন রাজগণ তাহাতে নবদ্বীপে সৈন্য সমনত হইয়া, গোড়েশব' আনুকূল্য কবেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিঃস্বর্ণে দিনযাপন কেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, দিগ্বিজয়কে গৃহবক্ষ্য রাখিয়া অশ্ব লইয়া একবার গোড়ে গমন কবেন। কিন্তু তথায় মৃগালিনী'ব সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহাব' প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, বিনা সাক্ষাতে গোড়যাত্রায় কি ফলোদয় হইবে? এই সকল আলোচনায় যদিও গোড়যাত্রায় হেমচন্দ্র নিঃস্তু হইলেন, তথাপি অন্ত্যাদন মৃগালিনীচিন্তায় হৃদয় নিযুক্ত থাকিত। একদা প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে, পর্য্যক্শোপবি শয়ন কবিয়া মৃগালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদয় সুখলাভ কবিতেন। মুক্ত বাতায়নপথে হেমচন্দ্র প্রকৃতব শোভা নিরীক্ষণ কবিতেন। নবীন

শরহৃদয় । রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নিশ্চল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, কচিৎ স্তরপরম্পবাবিশ্রুস্ত শ্বেতাশ্বদমালায় বিভূষিত । বাতায়নপথে তদুববহিনী ভাগীবথীও দেখা যাইতেছিল, ; ভাগীবথা বিশালোবসী, বহুদুব-বিসর্পিণী, চন্দ্রকর প্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিনী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী । নববারি সমাগম জনিত কল্লোল হেমচন্দ্র শুনিতে পাইতেছিলেন । বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল । বায়ু গম্ভীরবস্মে নিক্ষিপ্ত জলকণা সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রকুল বন্যকুমুমসংস্পর্শে সুরগন্ধি, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতী শ্রামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিপ্লুত কাবয়া, নদোতারবিবাজিত কাশকুমুম আন্দোলিত কবিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ কবিতেছিল । হেমচন্দ্র বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন ।

অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রালোকৈব গতি রোধ হইল । হেমচন্দ্র বাতায়নসন্নিধি একটা মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন । বাতায়ন, ভূমি হইতে কিছু উচ্চ—এজন্ত কাহাবও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না—কেবল একখানি মুখ দেখিলেন । মুখখানি অতি বিশালশ্মশ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ । সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, বাতায়নেব নিকটে, সম্মুখে

শ্রুতসংযুক্ত উষীষধারী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, হেমচন্দ্র শয়্য
হইতে লক্ষ্য দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন।

‘অসি গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন যে,
বাতায়নে আর মনুষ্যমুণ্ড নাই।

হেমচন্দ্র অসিহস্তে দ্বাবোদবাটন করিয়া গৃহ হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাতায়নতলে আসিলেন। তথায়
কেহ নাই।

গৃহেব চতুঃপার্শ্বে, গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে হেমচন্দ্র
ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকে দেখি-
লেন না।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন বাজপুত্র
পিতৃদত্ত যোদ্ধবেশে আপাদমস্তক আশ্রিত ‘মণ্ডিত
করিলেন। অকালজগদৌদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহাব
সুন্দর, মুখকান্তি অন্ধকাবনয় হইল। তিনি একাকা
সেই গম্ভাব নিশান্তে শব্দময় হইয়া যাত্রা করিলেন।
বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জর্জরিত পীরয়-
ছিলেন যে, বন্ধে তুবক আসিয়াছে।’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

বাণীকুলে ।

অক'ল'কলদোদযশ্বরূপ 'ভীমমূর্ত্তি' রাজপুত্র হেমচন্দ্র তুরকেব অন্ত্রাণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্যাঘ্র যেমন আহাৰ্য্য দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক দেখিবামাত্র সেইরূপ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথায় তুরকের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিৰতা ছিল না।

হেমচন্দ্র একটীমাত্র তুবক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত কথিলেন যে, হয় তুবকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূৰ্ব্বেচর। যদি 'তুবকসেনাই আসিয়া থাকে, তবে তৎক্ষণে একাকী সংগ্রাম সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক, প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহার অনুসন্ধান না করিয়া হেমচন্দ্র কদাচ স্থিৰ থাকিতে পারেন না। যে মহৎ কার্য্য জন্ম মৃগালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অথ রাত্ৰিতে নিদ্রাভিত্ত হইয়া সে কৰ্ম্মে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষ বানবধে হেমচন্দ্রের আন্তরিক আনন্দ। উষ্ণ-

ধারী মুণ্ড দেখিয়া অবধি তাঁহার জিঘাংসা ভয়ানক প্রবল হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্থিৰ হইবার সম্ভাবনা কিছু অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে হেমচন্দ্র রাজপথাভিমুখে চলিলেন।

উপবনগৃহ হইতে বাজপথ কিছু দূর। যে পথ বাহিত করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে যাইতে হয়, সে বিরল-লোক প্রবাহ গ্রাম্য পথ মাত্র। হেমচন্দ্র সেই পথে চলিলেন। সেই পথপার্শ্বে অতি বিস্তারিত, সুরমা সোপানাবলিশোভিত, এক দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকাপার্শ্বে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, রুদ্র, অশ্বথ, বট, আম্র, তিলিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলি যে সুশৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবিন্যস্ত ছিল এমন নহে। বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায় শাখায় সম্বন্ধ হইয়া বাণীতীরে ঘনানুক্কাব করিয়া রহিত। দিবসেও তথায় অন্ধকার। কিম্বদন্তী ছিল যে, সেই সরোবরে ভূতঘোনি বিহার করিত। এই সংস্কার প্রতিবাসীদিগের মনে এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে সচরাচর তথায় কেহ যাইত না। যদি যাইত, তবে একাকী কেহ যাইত না। নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না।

পৌরাণিক ধর্মের একাধিপত্যকালে হেমচন্দ্রও ভূতঘোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়শালী হইবেন, তাহার আর

বিচিত্র কি ? কিন্তু প্রেতসম্বন্ধে প্রতায়শালী বলিয়া তিনি গন্তব্য পথে যাইতে সঙ্কোচ কবেন, একরূপ ভীকৃষ্ণভাব নহেন। অতএব তিনি নিঃসঙ্কোচ হঠয়া বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন। নিঃসঙ্কোচ বাট কিন্তু কোতূহলশূন্য নহেন। বাপীৰ পূর্বে সর্বত্র এবং তৃত্ত্বীৰ প্রতি অনিমেষলোচন নিক্ষিপ্ত কাবতে কবিতে চলিলেন। সোপানমার্গের নিকটবর্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। জনশ্রুতিৰ প্রতি ঠাংহাব বিধ স দৃষ্টাকৃত হইল। দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ বক্ষা কবিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া ঠাংহার বোধ হইল। শ্বেতবসন অবেণীসম্বন্ধকুস্তলা ; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল হৃদয়, সর্বত্র আচ্ছন্ন কবিয়া রহিয়াছে। প্রেত বিবেচনা কবিয়া হেমচন্দ্র নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয় ? এতরাতে কে এ স্থানে ? সে ত তুবককে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে ? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিবিিলেন। নির্ভয়ে বাপীতীবারোহণ করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন। প্রেতিনী ঠাংহার আগমন জানিতে পাবিয়াও সরিল না। পূর্বমত বহিল। হেমচন্দ্রে ঠাংহার নিকটে

আসিলেন। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমচন্দ্রের দিকে ফিবিলা, কস্তুরী মুখাবরণকারী কেশদাম অপমৃত করিল। হেমচন্দ্র তাহার মুখ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর নিশ্চয়্যাপন্ন হইতেন না। কহিলেন, “কে, মনোবমা। তুমি এখানে?”

মনোবমা কহিল, “আমি এখানে অনেকবার আসি—
কিন্তু তুমি এখানে কেন?”

হেম। আমার কন্ম আছে।

মনো। এ বাত্রে কি কন্ম?

হেম। পশ্চাৎ বলিব, তুমি এ বাত্রে এখানে কেন?

মনো। তোমার এ বেশ কেন? হাতে শূল,
কাকালে তববাণি, তববাবে এ কি জ্বলিতেছে? এ কি
হীরা? মাথায় এ কি? হাতে বক্গক্ কনিয়া জ্বলি-
তেছে, এই বা কি? এও কি হীরা? এত হীরা পেলে
কোথা?

হেম। আমার, ছল।

মনো। এ বাত্রে এত হীরা পবিয়া কোথায় যাইতেছ?
চোবে যে কাড়িয়া লইবে?

হেম। আমার মিকট হইতে চোবে কাড়িতে পারি
না।

মনো । তা'এত, রা'ত্রেরে এত অস'কারে প্র'যোজন কি ?
তুমি কি বি'বাহ করিতে যাইতেছ ?

হেম । তো'মাব কি বোধ হয়, মনো'রমা ?

মনো । মানু'ষ মা'বিবাব জ্ঞান লইয়া কে'হ বি'বাহ
করিতে যায় না । তুমি যুদ্ধে যাইতেছ ।

হেম । কা'হাব সঙ্গে যুদ্ধ কবিব ? তুমিই বা এখানে
কি কবিত্তেছিলে ?

মনো । স্নান কবিত্তেছিলাম । স্নান করিয়া বা'তাসে
চুল শুকাইতেছিলাম । এই দেখ চুল এখনও ভিজা
রহিয়াছে ।

এই বলিয়া মনো'রমা আর্দ্র কেশ হেমচন্দ্রের হস্তে স্পর্শ
করাইলেন ।

হেম । বা'ত্রেরে স্নান কেন ?

মনো । আমাব গা জ্বালা কবে ।

হেম । গঙ্গাস্নান না কবিয়া এখানে কেন ?

মনো । এখানকা'ব জল বড় শীতল ।

হেম । তুমি সর্বদা এখানে আইস ?

মনো । আসি ।

হেম । আমি তো'মাব সহকৃৎ কবিত্তেছি—তো'মাব
বি'বাহ হইবে । বি'বাহ হইলে একু'প কি প্রকা'বে আসিবে ?

মনো । আগে বিবাহ হউক ।

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, “তোমার লজ্জা নাই —
তুমি কালামুখী ।”

মনো । তিবস্কার কর কেন ? তুমি যে বলিয়াছিলে
তিবস্কার করিবেনা ।

হেম । সে অপরাধ লইও না । এখান দিয়া কাহাকেও
যাইতে দেখিয়াছ ?

মনো । দেখিয়াছি ।

হেম । তাহার কি বেশ ?

মনো । তুবকের বেশ ।

হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “সে
কি ? তুমি তুবক চিনিলে কি প্রকারে ?”

মনো । আমি পূর্বে তুবক দেখিয়াছি ।

হেম । সে কি ? কোথায় দেখিলে ?

মনো । যেখানে দেখি না—তুমি কি সেই তুবকের
অনুসরণ করিবে ?

হেম । করিব—সে কোন পথে গেল ?

মনো । কেন ?

হেম । তাহাকে বধ করিব ।

মনো । মানুষেরে কি হবে ?

হেম । তুবক আমার পরম শত্রু ।

মনো । তবে একটা মারিয়া কি তৃপ্তি লাভ করিবে ?

হেম । আমি যত তুবক দেখিতে পাইব, তত মারিব ।

মনো । পারিবে ?

হেম । পারিব ।

মনোরমা বলিল, “তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস ।”

হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ কবিত্তে লাগিলেন । যখনযুদ্ধে এই বালিকা পথ প্রদর্শিনী !

মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিলেন ; বলিলেন, “আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস কবিত্তেছ ?”

হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন । বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন—মনোরমা কি মানুষী ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পশুপতি ।

গৌড়দেশেব ধর্ম্মাধিকার পশুপতি অসাধাবণ ব্যক্তি ; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর । বাজা বৃদ্ধ বান্ধকের ধর্ম্মানুসাবে পরমতাবলম্বী এবং বাজকার্য্যে অযত্নবান হইয়াছিলেন, সুতবাং প্রধানামাত্য ধর্ম্মাধিকারবেব হস্তেই গৌড়বাজ্যেব প্রকৃত ভাব অর্পিত হইয়াছিল । এবং সম্পদে অথবা ঐশ্বর্য্যে পশুপতি গৌড়েশ্ববেব সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন ।

পশুপতিব বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসব হইবে । তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ । তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্বাঙ্গ অস্থিমাংসেব উপযুক্তসংযোগে সুন্দর । তাঁহাব বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তিব মন্দিব স্বরূপ । নাসিকা, দীঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধাবণ উজ্জল্য সম্পন্ন । মুখকান্তি জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক এবং, অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তাব, গুণে কিছু পরুষভাবপ্রকাশক । তাহা হইলে কি হয় ।

বাজসভাতলে তাঁহার স্থায়ী সর্কাসসুন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। লোকে বলিত, গোড়দেশে তাঁদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি আতিথে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিচার প্রভাবে গোড় রাজ্যের প্রধান পুর্দে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন কবিতেন। তথায় কেশব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতিব পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্ট বশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানেব কন্যা লইয়া অদৃষ্ট হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল পর্যন্ত দ্বিতীয় দাব পবিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রাসাদতুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামানরননিঃসৃত জ্যোতিব অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অন্ধকারময়।

আজি রাত্রে সেই উচ্চ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে

পশুপতি একাকী দীপালোকে 'বসিয়া' আছেন। এই কক্ষের পশ্চাতেই আশ্রয়কানন। আশ্রয়কাননে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য একটি গুপ্তদ্বার আছে। সেই দ্বারে আসিয়া নিশীথকালে, মুহু মুহু কে আঘাত করিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বাব উদঘাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান। হেমচন্দ্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি, তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন।

পশুপতি সংস্কৃতে কহিলেন, "বুদ্ধিলাম আপনি তুরক-সেনাপতিব বিশ্বাসপাত্র। সুতবাং আমারও বিশ্বাস পাত্র। আপনাবই নাম মহম্মদ আলি? এখানে সেনাপতিব অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।"

যখন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতির তিন ভাগ ফারসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থভাগ যেরূপ সংস্কৃত তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ আলিবই সৃষ্ট সংস্কৃত। পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ করিলেন। পাঠক মহাশয়ের সে কষ্টভোগের প্রয়োজন নাহি, আমরা তাঁহার, সুবোধার্থে সে নূতন সংস্কৃত অনুবাদ কবিয়া দিতেছি।

যবন কহিল, “খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত আছেন। বিনা যুদ্ধে গোড়বিজয় কবিবেন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ বাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন?”

পশুপতি কহিলেন, “আমি এ বাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ কবিব কি না তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশবৈবিতা মহাপাপ। আমি এ কৰ্ম্ম কেন কবিব?”

য। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে কেন খিলিজির নিকট দূত প্রেরণ কবিয়াছিলেন?

প। তাঁহার যুদ্ধের সাধ কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা জানিবাব জ্ঞ।

য। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়া যাই। যুদ্ধই তাঁহার আনন্দ।

প। মনুষ্যযুদ্ধে, পশুযুদ্ধে চ? হস্তিযুদ্ধে কেমন আনন্দ?

মহম্মদ আলি সকোপে কহিলেন, ‘গোড়ে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসা পশুযুদ্ধেই আসা। বুঝিলাম ব্যঙ্গ কবিবার জ্ঞাই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আমবা যুদ্ধ জানি, ব্যঙ্গ জানি না। যাহা জানি তাহা কবিব।’

এই বলিয়া মুহম্মদ আলি গম্ভানাভ্যোগী হইল। পশু-
পতি কহিলেন,

। “ক্ৰণেক অপেক্ষা করুন। আব কিছু শুনিয়া যান।
আমি যখন হস্তে এ বাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি,—
অক্ষমও নহি। আমিই গোডেব বাজা, সেনরাজা নাম-
মাত্র। কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন বাজ্য কেন
আপনা দিগকে দিব?”

মুহম্মদ আলি কহিলেন, “আপনি কি চাহেন?”

প। খিলিজি কি দিবেন?

য। আপনাব যাগ আছে, তাহা সকলই থাকিবে—
আপনাব জীবন, ঐশ্বর্য, পদ সকলই থাকিবে। এই
মাত্র।

প। তবে আমি পাইলাম কি? এ সকলই ত আমার
আছে,—কি লোভে আমি এ গুরুতব পাপাশ্রয় করিব?

। য। আঘাদেব আনুকূল্য না করিলে কিছুই থাকিবে
না, যুদ্ধ করিলে, আপনাব ঐশ্বর্য, পদ, জীবন পর্যন্ত
অপহৃত হইবে।

প। তাহা যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যায় না।
আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা
করিবেন না। বিশেষ মগধে বিদ্রোহের উদ্যোগ হই-

তেছে, তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ জন্য এক্ষণে খিলিজি ব্যস্ত, গোড়ছয় চেষ্টা আপাততঃ কিছু দিন তাঁহাকে ত্যাগ কবিত্তে হইবে তাহাও অবগত আছি। আমার প্রার্থিত পুৰস্কার না দেন না দিবেন, কিন্তু যুদ্ধ কবাই যদি স্থিব হয়, তবে আমাদিগের এই উত্তম সময়। যখন বিহাবে বিদ্রোহীসেনা সজ্জিত হইবে গোড়েখবের সেনাও সাজিবে।

ম। ক্ষতি কি? পিপড়ের কামড়ের উপর মশা কামড়াইলে হাতী মরেনা। কিন্তু আপনার প্রার্থিত পুৰস্কার কি, তাহা গুনিয়া বাইতে বাসনা কবি।

প। শুনুন। আমিই এক্ষণে একুত গোড়েখব, কিন্তু লোকে আমাকে গোড়েখব বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা কবি। সেনবংশ লোপ হইয়া পশুপতি গোড়াধিপতি হউক।

ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন? আমাদিগকে কি দিবেন?

প। বাজকর মাত্র। মুসলমানের অধীনে কবপ্রদ মাত্র বাজা হইব।

ম। ভাল; আপনি যদি প্রকৃত গোড়েখব, রাজা যদি আপনার একরূপ করতলস্থ, তবে আমাদিগের সহিত

আপনার কথাবার্তা অবশ্যক, কি? আমাদিগেব সাহায্যের প্রয়োজন কি? আমাদিগকে কব দিবেন কেন?

প। তাতা স্পষ্ট কবিষা বলিব। ইহাতে কপটতা কবিব না। প্রথমতঃ, সেনরাজ আমাব প্রভু, বয়সে বৃদ্ধ, আমাকে স্নেহ কবেন। স্ববলে যদি আমি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত কবি—তবে অত্যন্ত লোকনিন্দা। . আপনারা কিছুমাত্র বুদ্ধোদ্যম দেখাইয়া, আমার আনুকূল্যে বিনা যুদ্ধে রাজধানী প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত কবিয়া আমাকে তদুপরি স্থাপিত কবিলে সে নিন্দা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য অনধিকাৰী অধিকাৰগত হইলেই বিদ্রোহেব সম্ভাবনা, আপনাদিগেব সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ কবিতে পাবিব। তৃতীয়তঃ, আমি স্বয়ং রাজা হইলে এক্ষণে সেনরাজাব সহিত আপনাদিগেব যে সম্বন্ধ, আমাব সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আমাদিগেব সহিত যুদ্ধেব সম্ভাবনা থাকিবে। যুদ্ধে আমি প্রস্তুত আছি—কিন্তু জয় পরাজয় উভয়েই সম্ভাবনা। জয় হইলে আমাব নূতন কিছু 'লাভ হইবে না', কিন্তু পরাজয়ে সৰ্বস্বহানি। কিন্তু আপনাদিগেব সহিত সন্ধি কবিয়া রাজ্যগ্রহণ কবিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না।

বিশেষতঃ সর্বদা যুদ্ধোদ্ভূত থাকিতে হইলে নূতন রাজ্য
সুশাসিত হয় না ।

ম। আপনি রাজনীতিজ্ঞের গ্রাম বিবেচনা করিয়া-
ছেন। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল।
আমিও একপ ম্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায়
বাক্য কবি। তিনি এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন
যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবনরাজ একেশ্বর হইবেন, অন্য
রাজার নামমাত্র। আমরা বাথিব না। কিন্তু আপনাকে
গোড়ে শাসনকর্তা কবিব। যেমন দিল্লীতে মহম্মদ
ঘোরির প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন, যেমন পূর্বদেশে কুতব-
উদ্দীনের প্রতিনিধিবৎ খিলিজি, তেমনই গোড়ে
আপনি বৎ খিলিজির প্রতিনিধি হইবেন। আপনি ইহাতে
স্বীকৃত আছেন কি না ?

পুণ্ডপতি কহিলেন, “আমি ইহাতে সন্মত হইলাম।”

ম। ভাল ; কিন্তু আমার আদ্য এক কথা জিজ্ঞাসা
আছে। আপনি যাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা
সাধন করিতে আপনার ক্ষমতা কি ?

প। আমার অনুমতি ব্যতীত একটি পদাতিকও
যুদ্ধ করিবে না। রাজকোষ আমার অনুচরের হস্তে।
আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটি কড়াও

ধ্বংস হইবে না।, পাঁচজন অনুচর লইয়া গিলিজিকে, বাজপুৰ প্রবেশ করিতে বলিও; কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না। “কে তোমরা?”

ম। আবণ্ড এক রুখা বাকি আছে। এই দেশে যবনেব পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ বাস্ত্রেই তাহাব মুণ্ড যবন শিবিরে প্রেবণ করিতে হইবে।

প। আপনারা আসিয়াহ তাহা ছেদন করিবেন—
আমি শরণাগত-হত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব?

ম। আমাদগেব হইতে হইবে না। যবন সমাগম শুনিবা মাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে। আজি সে নিশ্চিন্ত আছে। আজি লোক পাঠাইয়া তাহাকে বধ করুন।

প। ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।

ম। আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম।

প। যে আজ্ঞা। আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

ম। কি, আজ্ঞা করুন।

প। আমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব, পরে যদি আপনাবা আমাকে বহিষ্কৃত করেন?

ম। আমরা আপনার কথাই নির্ভর করিয়া অল্পমাত্র

সেনা লইয়া দূত পরিচয়ে পুরপ্রবেশ করিব। তাহাতে
'যদি আমরা স্বীকার মত কৰ্ম না করি, আপনি সহজেই
আমাদিগকে বহিষ্কৃত কবিয়া দিবেন।

প। আর যদি আপনারা, অন্য সেনা লইয়া না
আইসেন ?

ম। তবে যুদ্ধ করিবেন। এই বলিয়া মহম্মদ আলি
বিদায় হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

— :: —

চৌবোদ্ধরগিক ।

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্য
একজন গুপ্তদ্বার-নিকটে আসিয়া মৃদুস্ববে কহিল, “প্রবেশ
করিব ?”

পশুপতি কহিলেন, “কর।”

একজন চৌবোদ্ধরগিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত
হইলে পশুপতি আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
“কেমন শাস্ত্রশীল ! মঙ্গল সংবাদ ত ?”

চৌরোদ্ধবণিক কহিল, “আপনি একে একে প্রশ্ন করুন—আমি ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।”

পশু । যখনদিগেব অবস্থিতি স্থানে গিয়াছিলে ?

শাস্ত । সেখানে কেহ যাইতে পারে না ।

পশু । কেন ?

শাস্ত । অতি নিবিড় বন, দুর্ভেদ্য ।

পশু । কুঠার হস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে গেলে না কেন ?

শাস্ত । ব্যাঘ্র ভল্লুকের দৌবাখ্যা ।

পশু । সশস্ত্রে গেলে না কেন ?

শাস্ত । যে সকল কাঠুবিয়ারা ব্যাঘ্র ভল্লুক বধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই যখন-হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—কেহই ফিরিয়া আইসে নাই ।

পশু । তুমিও না হয় না আসিতে ?

শাস্ত । তাহা হইলে কে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিত ?

পশুপতি হাসিয়া কহিলেন, “তুমিই আসিতে ।”

শাস্তশীল প্রণাম করিয়া কহিল, “আমিই সংবাদ দিতে আসিয়াছি ।”

পশুপতি আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি প্রকারে গেলে ?”

শান্তু। প্রথমে উষ্ণীষ অস্ত্র ও তুরকী বেশ সংগ্রহ করিলাম। তাহা বাঁধিয়া পৃষ্ঠে সস্থাপিত করিলাম। তার উপর কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে বন-পথে প্রবেশ করিলাম। পরে যখন যবনেবা কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল—তখন আমি অপমৃত হইয়া বৃক্ষাশ্রয়ে বেশপরিবর্তন করিলাম। পবে মুসলমান হইয়া যবন-শিবিরে সর্বত্র বেড়াইলাম।

পশু। প্রশংসনীয় বটে। যবন-সৈন্য কত দেখিলে ?

শান্তু। সে বৃহৎ অরণ্যে যত ধরে। বোধ হয়, পঁচিশ হাজার হইবে।

পশুপতি ক্র কুঞ্চিত কবিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, “তাহাদিগের কথাবার্তা কি শুনিলে ?”

শান্তু। বিস্তর শুনিলাম—কিন্তু তাহার কিছুই আপনার নিকট নিবেদন করিতে পারিলাম না।

পশু। কেন ?

শান্তু। যাবনিক ভাষায় পণ্ডিত নহি।

পশুপতি হাস্য করিলেন। শান্তুও তখন কহিলেন

“মহম্মদ আলি এখানে যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ
আশঙ্কা করিতেছি।”

পশুপতি চমকিত হইয়া কহিলেন, “কেন ?”

শান্ত। তিনি অলুক্কিত হইয়া আসিতে পাবেন নাই।
তাহার আগমন কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে।

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, “কিসে
জানিলে ?”

শান্তশীল কহিলেন, “আমি শ্রীচরণ দর্শনে আসিবাব
সময় দেখিলাম যে বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল।
তাহার যুদ্ধের সাজ। তাহাব সঙ্গে কুথোপকথনে বুঝি-
লাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুৰীতে প্রবেশ কবিত্তে
দেখিয়া তাহার জন্ত প্রতীক্ষা কবিত্তেছে, অন্ধকাবে
তাহাকে চিনিতে পাবিলাম না।”

পশু। তাব পর ?

শান্ত। তাব পর, দাস তাহাকে চিত্রগৃহে কারাবদ্ধ
করিয়া বাধিয়া আসিয়াছে।

পশুপতি চৌরোদ্ধরণিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ;
এবং কহিলেন, “কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি
বিহিত করা যাইবেক। আজি রাত্রিতে সে কারাবদ্ধই-
থাক্। এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কার্য সাধন

করিতে হইবে । যবন-সেনাপতির ইচ্ছা অল্প রাত্রিতে তিনি 'মগধরাজপুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শন করেন । তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে ।

শান্ত । কার্য্য নিতান্ত সহজ নহে । রাজপুত্র পিপ্পড়ে মাছি নন ।

পশু । আমি তোমাকে একা যুদ্ধে যাইতে বলিতেছি না । কতকগুলি লোক লইয়া তাঁহাব বাড়ী আক্রমণ করিবে ।

শান্ত । লোকে কি বলিবে ?

পশু । লোকে বলিবে দস্যুতে তাঁহাতে মাঝিয়া গিয়াছে ।

শান্ত । যে-আজ্ঞা, আমি চলিলাম ।

পশুপতি শান্তনীলকে পুথস্কার দিয়া বিদায় করিলেন । পরে গৃহভ্রাস্তবে যথা বিচিত্র স্মৃষ্ণ কাককার্য্য-খচিত মন্দিবে অষ্টভুজামূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তথায় গমন করিয়া প্রতিমাগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । গাত্রোথান করিয়া যত্নকরে ভক্তভাবে ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া কহিলেন, “জননি ! বিশ্বপালিনি ! আমি অকুল সাগরে ঝাপ দিলাম— দেখিও মা ! আমার উদ্ধার করিও । আমি জননী-স্বকণা জন্মভূমি কখন দেবদেবী যবনকে বিক্রয় করিব

না । কেবলমাত্র এই আমার' পাপাভিসন্ধি যে. অক্ষয়
প্রাচীন রাজ্যের স্থানে আমি রাজা হইব । যেমন কণ্টকের
দ্বারা কণ্টক উদ্ধাব করিয়া পবে উভয় কণ্টকে দূরে
ফেলিয়া দেয়, তেমনি যবন-সহায়তার রাজ্যালাভ করিয়া
রাজ্য সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব । ইহাতে পাপ
কি মা ? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার
সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত করিব । জগৎ-
প্রসঙ্গি ! প্রসঙ্গ হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কব ।”

এই বলিয়া পশুপতি পুনরুপি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবি-
লেন । প্রণাম করিয়া গাত্রোথান করিলেন—শয্যাগৃহে
যাইবার জন্ত ফিবিয়া দেখিলেন—অপূর্ব দর্শন—

সম্মুখে দ্বাবদেশ ব্যাপ্ত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমাকপিণী
তরুণী দাড়াইয়া রহিয়াছে ।

পশুপতি প্রথমে ঠমকিত হইলেন—শিহবিয়া
উঠিলেন । পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে
ক্ষীত হইলেন ।

তরুণী বীণানিন্দিত স্ববে কহিলেন, “পশুপতি ।”

পশুপতি দেখিলেন—মনোরমা !



অষ্টম পরিচ্ছেদ

-০ - ০ -

মোহিনী ।

সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত
 দ্বাবদেশে, মনোরমাকে দোখরা, পশুপতিব হৃদয়
 উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রেব গায় ফীত হইয়া উঠিল। মনো-
 রমা নিতান্ত খর্বাকৃতা নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা
 বলিয়া বোধ হইত, তাহাব হেতু এই যে, মুখকাণ্ডি
 অনির্বচনীয় কোমল, অনির্বচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা
 বয়সের উদার্যাবিশিষ্ট; স্মৃতবাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ
 বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অগ্ৰায় হয়
 নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ কি ষোড়শ
 কি তদধিক, কি তন্ন্যন, তাহা ইতিহাসে লেখে না।
 পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহাব রূপ-
 রাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোবে, যৌবনে,
 সর্বকালে সে রূপরাশি হ্রলভ। একে বর্ণ সোণাব চাঁপা,
 তাহাতে ভূজঙ্গশিশুশ্রেণীর গায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখ-

খানি বেড়িয়া থাকে ; এক্ষণে বাপীজলসিকনে সে কেশ-খাজু
 হইয়াছে ; অর্ধচন্দ্রাকৃত নির্মল ললাট, ভ্রমর-ভর স্পন্দিত
 নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল ; মুহুমুহুঃ
 আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রক্তযুক্ত সুগঠন নাসা ; অধরৌষ্ঠ
 যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোক্তির
 রক্তকুসুমাবলীর স্তবযুগল তুল্য ; কপোল যেন চন্দ্রকরো-
 জ্জল, নিত্যানু স্থিব, গঙ্গাধুবিস্তাববৎ প্রসন্ন ; শাবকহিংসা-
 শঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীব-ন্যায় গ্রীবা,—বেণী বাধিলেও
 সে গ্রীবাব উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া
 কেলি কবে । দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিংবা
 চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিংবা চন্দ্রকিরণ
 যদি শবীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল
 গড়িতে পাবা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই
 গড়া যাইতে পাবিত । এ সকলই অন্ত মূন্দবীৰ আছে ;
 মনোবমার রূপবাশি অতুল কেবল তাঁহার সর্বাঙ্গীণ
 সৌকুমার্য্যের জন্ত ; তাঁহার বদন সুকুমার ; অধর,
 জয়ুগ, ললাট সুকুমার ; সুকুমার কপোল ; সুকুমার
 কেশ । অলকাবলী যে ভূজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার
 ভূজঙ্গশিশু । গ্রীবায় 'গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য্য ; বাহুতে,
 বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমার্য্য ; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই

সৌফুমার্যা ; সুকুমার চরণ, চরণবিষ্ণাস সুকুমার ।
 গমন সুকুমার, বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুম্মিত লতাব মন্দা-
 ন্দোলন তুল্যা , বচন সুকুমার, নিশীথ সময়ে জম্ববাশি-
 পাব হইতে সমাগত বিব্রহ সঙ্গীত তুল্যা ; কটাক্ষ সুকুমার,
 ক্রমাত্র জন্ত মেঘমালাযুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্যা ;
 আব ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া
 আছেন — পশুপতিব মুখাবলোকন জন্ত উন্নতমুখী,
 নয়নতারা উর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, অবদ্ধ
 কেশবাশিব কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র
 অগ্রবর্তী কবিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে,
 ও ভঙ্গীও সুকুমার ; নবীন সূর্যোদয়ে সন্তঃপ্রফুল্লদলমালা-
 ময়ী নলিনীব প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্যা সুকুমার । সেই মাধুর্যাময়
 দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপেক আলোক পতিত
 হইল । পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন ।

নবম পরিচ্ছেদ

-০০-

মোহিতা ।

পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে মনোরমাব সৌন্দর্য্য সাগরের এক অপূর্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন । যেমন সূর্য্যের প্রথর করমালার হাশ্রময় অনুরাশি মেঘসঙ্ঘারে ক্রমে ক্রমে গস্তীর কৃষ্ণকাস্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গস্তীর হইতে লাগিল । আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব বহিল না । অপূর্ব তেজোভিব্যক্তিব সাহিত, অগল্ভ বয়সেবও দুর্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল । সবলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল । পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ ?—এ কি ? আজি তোমার এ ভাব কেন ?”

মনোরমা উত্তর করিলেন, “আমার কি ভাব দেখিলে ?”

প। তোমার দুই মূর্তি—এক মূর্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা—সে মূর্তিতে কেন আসিলে না?—সেইরূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর, তোমার এই মূর্তি "গঙ্গারী" তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রথববুদ্ধিশালিনী—এ মূর্তি দেখিলে আমি ভীত হই। তখন বুঝিতে পারি যে, তুমি কোন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজি তুমি এ মূর্তিতে আমাকে ভয় দেখাইতে কেন আসিয়াছ?

ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি করিতেছ?

প। আমি রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলাম—কিন্তু তুমি—

ম। পশুপতি, আবার? রাজকার্যে না নিজকার্যে?

প। নিজকার্যই বল। রাজকার্যেই হউক, আর নিজ কার্যেই হউক, আমি কবে না ব্যস্ত থাকি? তুমি আজি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

ম। আমি সকল শুনিয়াছি।

প। কি শুনিয়াছ?

ম। যবনেব সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা—শান্তশীলের সঙ্গে মন্ত্রণা—দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া সকল শুনিয়াছি।

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেঘানুকায়ে ব্যাপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন,

“ভালই হইয়াছে। সকল কথাই আমি তোমাকে বলিতাম—না হয় তুমি আগে শুনিয়াছ। তুমি কোন্ কণ্ঠ না জান?”

ম। পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?

প। কেন, মনোরমা? তোমার জগ্গই আমি এ সম্বন্ধে কবিয়াছি। আমি এক্ষণে বাজভৃত্য, ইচ্ছামত কাৰ্য্য করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পবিত্রাক্ত হইব, কিন্তু যখন আমি স্বয়ং বাজা হইব, তখন কে আমার ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীচের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবপরিণয়ে নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।

মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “পশুপতি, সে সকল আমার স্বপ্নমাত্র। তুমি বাজা হইলে, আমার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। আমি কখনও তোমার মুহিবী হইব না।”

প। কেন মনোরমা?

ম। কেন? তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিলে অর্থাৎ কি আমার ভালবাসিবে? বাজাই তোমার হৃদয়ে প্রধান স্থান পাইবে!—তখন আমার প্রতি তোমার অনাদর

হইবে। তুমি যদি ভাল না বাসিলে—তবে আমি কেন তোমার পত্নীত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িব ?

প। এ কথা কে কেন মনে স্থান দিতেছ। আগে তুমি—পবে রাজ্য। আমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে।

ম। রাজ্য হইয়া যদি তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পাবিবে না। তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে। জৈন বাজার রাজ্য থাকে না।

পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার সুখপ্রতি চাহিয়া বহিলেন ; কঠিনে, “যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি ? না হয়, তাহাই হউক। তোমার জন্ম রাজ্য ত্যাগ করিব।”

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন ? ত্যাগেব জন্ম গ্রহণে ফল কি ?

প। তোমার পাণিগ্রহণ।

ম। সে আশা ত্যাগ কর। • তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না।

প। কেন, মনোরমা ! আমি কি অপরাধ করিলাম ?

ম। তুমি বিশ্বাসঘাতক—আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব ? কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব ?

প। কেন, আমি কিম্বে, বিশ্বাসঘাতক হইলাম ?

“ম। তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ, শরণাগত রাজপুত্রকে মাঝিবার কল্পনা করিতেছ ; ইহা কি বিশ্বাসঘাতকেব কর্ম নয় ? যে প্রভুর নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন ?

পশুপতি নীরব হইয়া বহিলেন । মনোময়া পুনৰপি বলিতে লাগিলেন, “পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্কৃত্তি ত্যাগ কব ।”

পশুপতি পূৰ্ব্ববৎ অধোবদনে বহিলেন, তাঁহার রাজ্য-কাঙ্ক্ষা এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর । কিন্তু রাজ্য লাভেব যত্ন করিলে মনোরমাব প্রণয় হারাইতে হয় সেও অত্যাঙ্গ । উভয় সঙ্কটে তাঁহাব চিন্তামধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল । তাঁহাব মতিব স্থিরতা দূৰ হইতে লাগিল । “যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি ?” এইকপ পুনঃপুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল । কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগিলেন, “কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা, জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে, সকলের ঘৃণিত হইব ।” তাহা কি

প্রকারে সহিব ?” পশুপতি নাওবে বহিলেন ; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ।

মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিল, “শুন পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না । আমি চলিলাম । কিন্তু এই প্রাজ্ঞা কবিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকেব সঙ্গে ইহ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না ।”

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল । পশুপতি, বোদন করিয়া উঠিলেন ।

অমনই মনোরমা আঁবাব ফিরিল । আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিল । পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন । দেখিলেন, তেজোগর্ভবিশিষ্টা, কুঙ্কিতক্রবীচবিক্ষেপকারিণী, সবস্বতী মূর্তি আর নাই ; সে প্রতিভা দেবী অস্তরূপে হইয়াছেন ; কুমুমসুকুমাবী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে বোদন করিতেছে ।

মনোরমা কহিলেন, “পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন ?”

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, “তোমার কথায় ।”

ম । কেন, আমি কি বলিয়াছি ?

প । তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে ।

ম। আব আমি এমন করিব না ।

প। তুমি আমার বাজমহিষী হইবে ?

ম। হইব ।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল । উভয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন । সহসা মনোবমা পক্ষিণীর আয় গাত্রো-
থান করিয়া চলিয়া গেলেন ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

— ১০ —

ফাঁদ ।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীব হইতে হেম-
চন্দ্র মনোবমার অনুবর্তী হইয়া যবন-সন্ধানে আসিতে-
ছিলেন । মনোরমা ধর্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে
থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, “সম্মুখে এই অটালিকা
দেখিতেছ ?”

হেম । দেখিতেছি ।

মনো । এখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে ।

হেম। কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মনোরমা কহিলেন, “তুমি এইখানে গাছের আড়ালে থাক। যখনকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইবে।”

হেম। তুমি কোথায় যাইবে ?

মনো। আমিও এই বাড়ীতে যাইব।

হেমচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। মনোরমার আচরণ দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। তাহার পরানর্শানুসাবে পথিপার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া বহিলেন। মনোরমা গুপ্তপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে শান্তশীল পণ্ডপতিব গৃহে আসিতোছিল। সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। শান্তশীল সন্দেহ প্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। তথায় হেমচন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে চোব অনুমান কহিল, “কি তুমি ? এখানে কি করিতেছ ?” পরে তৎক্ষণে হেমচন্দ্রের বহুমূল্যের অলঙ্কারশোভিত বোদ্ধদেশ দেখিয়া কহিল, “আপনি কে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমি যে হই না কেন ?”

শা। আপনি এখানে কি করিতেছেন ?

হে। আমি এখানে যরনানুসন্ধান করিতেছি।

শান্তশীল চমকিত হইয়া কহিল, “যবন কোথায় ?”

হে । এইগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ।

শান্তশীল ভীত ব্যক্তির সুরে কহিল, “এ গৃহে কেন ?”

হে । তাহা আমি জানি না ।

শা । এ গৃহ কাহার ?

হে । তাহা জানি না ।

শা । তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে এই গৃহে যবন প্রবেশ করিয়াছে ?

হে । তা তোমার শুনিয়া কি হইবে ?

শা । এই গৃহ আমার । যদি যবন ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কোন অনিষ্টকামনা করিয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই । আপনি যোদ্ধা এবং যবনদেষী দেখিতেছি । যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমাব সঙ্গে আসুন—উভয়ে চোবকে ধৃত করিব ।

হেমচন্দ্র সম্মত হইয়া শান্তশীলের সঙ্গে চলিলেন । শান্তশীল সিংহদাব দিয়া পশুপতির গৃহে হেমচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, “এই গৃহমধ্যে আমার সুবর্ণ রত্নাদি সকল আছে, আপনি ইহার প্রহরায় অবস্থিতি করুন । আমি

ততক্ষণ সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যখন লুক্কায়িত আছে ।”

এই কথা বলিয়াই শান্তনীল সেই কক্ষ হইতে নিঃশব্দ হইলেন । এবং হেমচন্দ্র কোন উত্তর দিতে না দিতেই বাহির দিকে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন । হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।



মুকু ।

মনোবমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই দ্রুতপদে চিত্রগুহে আসিল । পশুপতির সহিত শান্তনীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিল যে, ঐ ঘবে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন । আসিয়াই চিত্রগুহের দ্বাৰানোচন করিল । হেমচন্দ্রকে কহিল, “হেমচন্দ্র, বাহির হইয়া যাও ।”

হেমচন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিলেন । মনোবমা ঠাণ্ডাব সঙ্গে সঙ্গে আসিল । তখন হেমচন্দ্র মনোবমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন ?”

ম। তাহা পবে বলিব ।

হে। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে ?

ম। শান্তশীল ।

হে। শান্তশীল কে ?

ম। চৌবোদ্ধবণিক ।

হে। এই কি তাহার বাড়ী ?

ম। না ।

হে। এ কাহার বাড়ী ?

ম। পবে বলিব ।

হে। যখন কোথায় গেল ?

ম। শিবিরে গিয়াছে ।

হে। শিবির ! কত যখন আসিয়াছে ?

ম। পঁচিশ হাজার ।

হে। কোথায় তাহাদের শিবির ?

ম। মহাবনে ।

হে। মহাবন কোথায় ?

ম। এট নগরের উত্তরে কিছু দূরে ।

হেমচন্দ্র করলখকপোণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ।

মনোবমা কহিল, “ভাবিতেছ কেন ? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ?”

হে । পঁচিশ হাজারের সঙ্গে একেব যুদ্ধ সম্ভবে ?

ম । তবে কি করিবে—যবে ফিঙ্গিয়া যাইবে ?

হে । এখন ঘবে যাব না ।

ম । কোথা যাবে ?

হে । মহাবনে ।

ম । যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন ?

হে । যবনদিগকে দেখিতে ।

ম । যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে ?

হে । দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে তাহাদিগকে মারিতে পারিব !

মনোবমা চমকিয়া উঠিলেন । কহিলেন, “বিশ হাজার মানুষ মারিবে ? কি সর্বনাশ ! ছি ! ছি !”

হে । মনোবমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে ?

ম । আবও সংবাদ আছে । আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্ত তোমাব ঘরে দস্যু আসিবে । আজি ঘরে যাইও না ।

এই বলিয়া মনোবমা উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করিল ।

ছাদশ পরিচ্ছেদ

অতিথি-সংকাথ

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়া এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত কবিয়া তদুপরি আবোতণ করিলেন ; এবং অশ্ব কশাঘাত কবিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা কবিলেন । নগর পাব হইলেন ; তৎপরে প্রান্তর । প্রান্তবেবও কিয়দংশ পাব হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন । দেখিলেন স্কন্ধে একটা তীর বিদ্ধ হইয়াছে । পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল । ফিরিয়া দেখিলেন, তিনজন অশ্বাবোহী আসিতেছে ।

হেমচন্দ্র খোটকের মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগেব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ফিবিয়াযাত্রা দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বাবোহী তাঁহাকে লক্ষ্য কবিয়া এক এক শবস্কান কবিল । হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করস্ত শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন ।

অশ্বাবোহিগণ পুনর্বার একেবারে শরসংযোগ করিল ।

এবং তাহা নিষারিত হইতে না হইতেই পুনর্বার শরত্ৰয়
ত্যাগ করিল ।

এইরূপ অবিরতহস্তে হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ
কবিত্তে লাগিল । হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র বন্ধুদিগ্ৰিত
চৰ্ম্ম হস্তে লইলেন, এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে
সেই শবজাল বর্ষণ নিবাকরণ কবিত্তে লাগিলেন ;
কদাচিত্ দুই এক শব অশ্বশবাবে বিক্র হইল মাত্র । স্বয়ং
অক্ষত রহিলেন ।

বিস্মিত হইয়া অশ্বাৰোহিত্রয় নিবস্ত হইল । পবম্পবে
কি পরামর্শ করিত্তে লাগিল । হেমচন্দ্র সেই অবকাশে
একজনের প্রতি এক শবত্যাগ করিলেন । সে অব্যর্থ
লক্ষান । ‘শব, একজন অশ্বাৰোহীব ললাটমধ্যে বিক্র হইল ।
সে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ধবাতলশায়িত হইল ।

তৎক্ষণাৎ অপর দুই জনে অগ্নে কশাঘাত কবিয়া, শূল-
যুগল প্রণত কবিয়া হেমচন্দ্রের প্রতিধাবমান হইল । এবং
শূলক্ষেপযোগ্য নৈকটা প্রাপ্ত হইলে শূলক্ষেপ করিল ।
যদি তাহারা হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য কবিয়া শূল ত্যাগ কবিত্ত,
তবে হেমচন্দ্রের বিচিত্র শিকায় তাহা নিষারিত হওয়ার
সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা না কবিয়া আক্রমণকারীবা
হেমচন্দ্রের স্নান প্রতি লক্ষ্য কবিয়া শূলত্যাগ কবিয়াছিল ।

ততদুব অধঃপর্য্যস্ত হস্তসঞ্চালনে হেমচন্দ্রের বিলম্ব হইল। একেব শূল নিবারিত হইল, অপবেব নিবারিত হইল। না। শূল অশ্বেব গ্রীবাতলে বিদ্ধ হইল। সেই আঘাত প্রাপ্তিমাত্র সে রমণীয় ঘোটক মুম্বু হইয়া ভূতলে পড়িল।

সুশিক্ষিতের গায় হেমচন্দ্র পতনশীল অশ্ব হইতে লক্ষ্য দিয়া ভূতলে দাড়াইলেন। এবং পলকমধ্যে নিজ করস্থ কবাল শূল উন্নত কাব্যয়া কহিলেন, “আমার পিতৃদত্ত শূল শক্রবক্ত পান না কাব্যয়া, কখন ফেবে নাই।” তাহার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় অশ্বাবোহী ভূতলে পতিত হইল।

ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বাবোহী অশ্বেব মুখ ফিরাইয়া বেগে পলায়ন কবিল। সেই শান্তশীল।

হেমচন্দ্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ স্বকৃবিদ্ধ তীর মোচন কবিলেন। তীব কিছু অধিক মাংসভেদ কুরিয়াছিল—মোচন যাত্র অতিশয় শোণিতক্ষতি হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র নিজ বৃদ্ধ দ্বাবা তাহার দিবাবণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা : নিফল হইল। ক্রমে হেমচন্দ্র বক্রক্ষতি হেতু দুর্বল হইতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন যে, যবন শিবিরে গমনেব অদ্য আর কোন সম্ভাবনা নাই। অশ্ব হত হইয়াছে—নিজবল হত হই-

তেছে । অতএব অপ্রসন্ন মনে, ধীরে ধীরে, নগরাভিমুখে
প্রত্যাবর্তন কবিত্তে লাগিলেন ।

হেমচন্দ্র প্রাস্তুর পার হইলেন । তখন শরীর নিতান্ত
অবশ হইয়া আসিল—শোণিতশোভে সর্বাঙ্গ ক্ষাদ হইল ;
গতিশক্তি রহিত হইয়া আসিতে লাগিল । কষ্টে নগর মধ্যে
প্রবেশ করিলেন । আব ষাইতে পাবেন না । এক কুটারেব
মিকট বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন । তখন বজনী প্রভাত
হইয়াছে । রাত্রিজাগরণ—সমস্ত রাত্রির পবিত্রম—রক্ত-
স্রাবে বলহানি—এই সফল কারণে হেমচন্দ্রের চক্ষুতে
পৃথিবী ঘূষিতে লাগিল । তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন ।
চক্ষু মুদ্রিত হইল—নিদ্রা প্রবল হইল—চেতনা অপহৃত
হইল । নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে গায়িতেছে,

“কণ্টকে গঠিল বিবি মৃগাল অধমে ।”



ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ।

— ୦୦୦ —



তৃতীয় খণ্ড ।

— ০০০ —

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

“উনি তোমার কে ?”

যে কুটারের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটারমধ্যে এক পাটনী বাস করিত। কুটারমধ্যে তিনটি ঘর। এক ঘরে পাটনীর পাঁকাঁদি সমাপন হইত। অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশুসন্তান সকল লইয়া শয়ন করিত। তৃতীয় ঘরে পাটনী যুবতী কন্যা রত্নময়ী আর অপর দুইটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল। সেই দুইটি স্ত্রীলোক পাঠক মহাশয়ের নিকট পরিচিতা ;

মৃগালিনী আর গিরিজাম্মা নবদীপে অশ্রুত আশ্রয় না
পাইয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন ।

একে একে তিনটী স্ত্রীলোক প্রভাতে জাগবিতা
হইল । প্রথমে বন্দুয়ী জাগিল । গিরিজাম্মাকে সম্বোধন
করিয়া কহিল,

“সই ?”

গি । কি সই ?

র । তুমি কোথায় সই ?

গি । বিছানা সই ।

র । উঠ না সই !

গি । না সই ।

র । গায়ে ঝল দিব সই ।

গি । জন্মসই ? ভাল সই, তাও সই ।

র । নহিলে ছাড়ি কই ।

গি । ছাড়িবে কেন সই ? তুমি আমার প্রাণের
সই—তোমার মত আছে কই ? তুমি পাবঘাটার রসমই—
তোমায় না কইলে আর কারে কই ?

র । কই সই তুমি চিবজই ; আমি তোমার কাছে
বোন হই, আব মিলাইতে পানি কই ?

গি । আরও মিল চাই ?

র। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই,
আমি কাজে যাই।

এহ বলিয়া রত্নময়ী গৃহকর্মে গেল। 'মৃগালিনী এ
পর্যন্ত কোন কথা কহেন নাই। এখন গিরিজায়া
তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

“ঠাকুবাণি, জাগিয়াছ ?”

মৃগালিনী কহিলেন, “জাগিয়াই আছি। জাগিয়াই
থাকি।”

গি। কি ভাবিতেছিলে ?

মৃ। যাহা ভাবি।

গিরিজায়া তখন গম্ভীরভাবে কহিল, “কি করিব ?
আমার দোষ নাই। আমি শুনিয়াছি তিনি এই
নগরমধ্যে আছেন,; এ পর্যন্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্তু
আমরা ত সবে দুই তিন দিন আসিয়াছি। শীঘ্র সন্ধান
করিব।”

মৃ। গিরিজায়া, যদি এ নগরে সন্ধান না পাই ?
তবে যে এই পাটনার গৃহে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করিতে
হইবে। আমার যে যাইবার স্থান নাই।

মৃগালিনী উপাধানে মুখ লুকাইলেন। গিরিজায়ারও
গণ্ডে নীরবস্ত্র অশ্রু বহিতে লাগিল।

এমন সময়ে 'রত্নময়ী শশবাস্তে গৃহমধ্যে আসিয়া কহিল, "সই! সই! দেখিয়া যাও। আমাদের বট-ভলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য্য পুরুষ!"

গিরিজায়া কুটীরদ্বাৰে দেখিতে আসিল। মৃগালিনীও কুটীবদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিল।

'সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃগালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন। গিরিজায়া গায়িল,

“কণ্টকে গঠিল বিধি মৃগাল অধমে।”

সেই ধ্বনি স্বপ্নবৎ হেমচন্দ্রের কৰ্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মৃগালিনী গিরিজায়ার কণ্ঠকণ্ঠন দেখিয়া কহিলেন,

“চুপ, রাক্ষসী, আমাদিগের দেখা দেওয়া হইবে না, ঐ উনি জাগরিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন। উনি যেখানে যান, অদৃশ্যভাবে দূরে থাকিয়া উঁহার সঙ্গ য়াও।—এ কি! উঁহার অঙ্গ রত্নময় দেখিতেছি কেন? চল, তবে আমিও সঙ্গ চলিলাম।”

হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত

দেখিয়া তিনি শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাত্রোথান করিলেন,
এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন ।

হেমচন্দ্র কিয়দূর গেলে, মৃগালিনী আর গিরিজায়া
উাহার অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন । তখন
রত্নময়ী জিজ্ঞাসা করিল,

“ঠাকুবানি, উনি তোমাব কে ?”

মৃগালিনী কহিলেন, “দেবতা জানেন ।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

প্রতিজ্ঞা—পর্বতো বহিমান্ ।

বিশ্রাম করিয়া হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছিলেন ।
শোণিতস্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়াছিল । শূলে ভর
করিয়া হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা দ্বারদেশে দাড়াইয়া
আছেন ।

মৃগালিনী ও গিরিজায়া অন্তরালে থাকিয়া মনো
রমাকে দেখিলেন ।

মনোবমা চিত্রাৰ্পিত পুত্ৰলিকার স্থায় দাঁড়াইয়া বহিলেন । দেখিয়া মৃগালিনী মনে মনে ভাবিলেন, “আমাব প্রভু যদি রূপে বশীভূত হইলেন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে।” গিরিজায়া ভাবিল, “রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হইলেন, তবে আমার ঠাকুরাণীব কপাল ভাঙ্গিয়াছে।”

হেমচন্দ্র মনোবমার নিকট আসিয়া কহিলেন, “মনোরমা—এমন কবিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?”

মনোবমা কোন কথা কহিলেন না । হেমচন্দ্র পুনরপি ডাকিলেন, “মনোবমা !”

তথাপি উত্তর নাই ; হেমচন্দ্র দেখিলেন আকাশমার্গে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে ।

হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, “মনোবমা, কি হইয়াছে?”

তখন মনোবমা ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিল । এবং কিম্বৎকাল অনিঃশব্দে লোচনে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল । পরে হেমচন্দ্রের রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল । তখন মনোরমা বিস্মিত হইয়া কহিল,

“এ কি হেমচন্দ্র ! রক্ত কেন ? তোমার মুখ শুষ্ক ; তুমি কি আহত হইয়াছ ?”

হেমচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্বক্কের ক্ষত দেখাইয়া দিলেন ।

মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্ত ধাবণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেল । এবং পলকমধ্যে বারিপূর্ণ ভূস্রাব আনীত কবিয়া, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রবসন পবিত্যক্ত করাইয়া অস্ত্রেণ কধিব সকল ধৌত করিল । এবং গোজাতিপ্রলোভন নবদূর্বাদল ভূমি হইতে ছিন্ন কবিয়া আপন কুন্দনিন্দিত দন্তে চর্কিত করিল । পরে তাহা ক্ষতমুখে প্রয়োগ করিয়া উপবীতাকারে বস্ত্র দ্বারা বাধিল । তখন কহিল,

“হেমচন্দ্র ! আর কি করিব ? তুমি সমস্ত বাত্রি জাগরণ কবিয়াছ, নিদ্রা যাইবে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতর হইতেছি ।”

মৃগালিনী মনোবমার কার্য্য দেখিয়া চিন্তিতান্তঃকরণে গিবিজ্ঞায়াকে কহিলেন; “এ কে গিবিজ্ঞায়া ?”

গি । নাম শুনিলাম মনোবমা ।

মৃ । এ কি হেমচন্দ্রের মনোবমা ?

গি । তুমি কি বিবেচনা করিতেছ ?

মৃ । আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী ।

আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল ।

যে কার্যের জন্য আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল—
মনোরমা সে কার্য সম্পন্ন করিল—দেবতারা উহাকে
আযুজ্যতী করুন। গিরিজায়া, আমি গৃহে চলিলাম,
আমার আব থাকি উচিত নহে। - তুমি এই পল্লীতে থাক,
হেমচন্দ্র কেমন থাকেন স.বাদ লইয়া যাইও। মনোবমা
যেই হউক, হেমচন্দ্র আমাবই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

-০০-

হেতু—ধূমাংস।

মনোবমা এবং হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মৃগা-
লিনীকে বিদায় দিয়া গিরিজায়া উদ্যান-গৃহ প্রদক্ষিণ
করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে বাতায়ন-পথ মুক্ত
দেখিলেন, সেইখানে সাবধানে 'মুখ উন্নত' করিয়া
গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। এক কক্ষ হেমচন্দ্রকে
শয়নাবস্থায় দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তাঁহার
শয্যোপরি মনোরমা বসিয়া আছে। গিরিজায়া সেই
বাতায়ন-তলে উপবেশন করিলেন। পূর্বরাত্রে সেই
বাতায়ন পথে যখন হেমচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

বাতায়ন-তলে উপবেশনে গিবিজায়ার অভিপ্রায় এই ছিল যে, হেমচন্দ্র মনোরমায় কি কথোপকথন হয়, তাহা বিবুলে থাকিয়া শ্রবণ কবে । কিন্তু হেমচন্দ্র নিদ্রাগত, কোন কথোপকথনই ত হয় না । 'একাকী নীববে' সেই বাতায়ন-তলে বসিয়া গিবিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল । কথা কহিতে পার না, হাসিতে পার না, ব্যঙ্গ কহিতে পার না, বড়ই কষ্ট—স্নানস্নান কণ্ডুয়িত হইয়া উঠিল । মনেমনে ভাবিতে লাগিল—সেই পাপিষ্ঠ দিগ্বিজয়ই বা কোথায় ? তাহাকে পাইলেও ত মুখ খুলিয়া বাঁচি । কিন্তু দিগ্বিজয় গৃহমধ্যে প্রভু কার্যে নিবৃত্ত ছিল—তাহারও সাক্ষাৎ পাইল না । তখন অন্য পাত্রাভাবে গিবিজায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিল । সে কথোপকথন শুনিতে পাঠক মহাশয়ের কোতূহল জন্মিয়া থাকিলে, প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে তাহা জানাইতে পারি । গিবিজায়াই প্রশ্নকর্ত্রী, গিবিজায়াই উত্তরদাত্রী ।

প্র । ওলো তুই বসিয়া কে লো ?

উ । গিরিজায়া লো ।

প্র । এখানে কেন লো ?

উ । মৃগালিনীর জগ্গে লো ।

প্র । মৃগালিনী তোর কে ?

- উ । কেউ না ।
- প্র । তবে তাব জন্তে তোব এত মাথা ব্যথা কেন ?
- উ । আমার আব কাজ কি ? বেড়াইয়া বেড়াইয়া কি করিব ?
- প্র । মৃগালিনীর জন্তে এখানে কেন ?
- উ । এখানে তাব একটি শিকলীকাটা পাখী আছে ।
- প্র । পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি ?
- উ । শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব ? ধরিবই বা কিরূপে ?
- প্র । তবে বসিয়া কেন ?
- উ । দেখি শিকল কেটেছে কি না ।
- প্র । কেটেছে না কেটেছে জেনে কি হইবে ?
- উ । পাখীটাব জন্তে মৃগালিনী প্রতিরাতে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—অঞ্জি না জানি কতই কাঁদবে । যদি ভাল স্ববাদ লহরা যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে ।
- প্র । আব যদি শিকল কেটে থাকে ?
- উ । মৃগালিনীকে বলিব যে, পাখী হাতছাড়া হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নামে নিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন । পড়া পাখীর আশা ছাড় । পিঁজরা খালি রাখিও না ।

প্র। ম' ভিখারীর মেঘে। তুই আপনাব মনেব
মত কথা বলিলি! মৃগালিনী যদি রাগ করিয়া পিঞ্জরা
ভাঙ্গিয়া ফেলে?

উ। ঠিক বলেছি'ম্ স্বই! তা সে পারে। বলা হবে না।

প্র। তবে এখানে বসিয়া রোদ্রে পুড়িয়া মরিস্ কেন?

উ। বড় মাথা ধবিয়াছে তাই। এই যে মেয়েটা
মবেব ভিতর বসিয়া আছে—এ মেয়েটা বোবা—নহিলে
এখনও কথা কয় না কেন? মেয়েমানুষের মুখ এখনও বন্ধ?

ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। হেম-
চন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মনোরমা তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কেমন, তোমার ঘুম হয়েছে?”

হে। বেশ ঘুম হয়েছে।

ম। এখন বল কি প্রকারে আঘাত পাইলে?

তখন হেমচন্দ্র রাত্রিষ ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন।
শুনিয়া মনোরমা চিন্তা করিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার জিজ্ঞাস্য শেষ হইল।
এখন আমার কথার উত্তর দাও। কালি রাত্ৰিতে তুমি
আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা যাহা ঘটয়াছিল,
সকল বল।”

মনোরমা মৃদু মৃদু অক্ষুটস্ববে কি বলিল। গিরি
জায়া তাহা শুনিতে পাইল না। বুঝিল চুপি চুপি কি কথা
হইল।

গিরিজায়া আর কোন কথা শুনিতে না পাইয়া
গাত্রোথান করিল। তখন পুনর্বার প্রশ্নোত্তরমালা
মনোমধ্যে গ্রথিত হইতে লাগিল।

প্র। কি বুঝিলে ?

উ। কয়েকটি লক্ষণ মাত্র।

প্র। কি কি লক্ষণ ?

গিরিজায়া অশ্লুণ্ডিতে গণিতে লাগিল, এক—
যেহেটা আশ্চর্য্য সুন্দরী, আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ়
থাকে ? দুই—মনোরমা ত হেমচন্দ্রকে ভাল বাসে, নহিলে
এত যত্ন করিল কেন ? তিন—একত্র বাস। চারি—
একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ—চুপি চুপি কথা।

প্র। মনোরমা ভালবাসে, হেমচন্দ্রের কি ?

উ। বাঙাস না থাকিলে কি, জলে ঢেউ হয় ?
আমাকে যদি কেহ ভাল বাসে, আমি তাহাকে ভাল-
বাসিবে সন্দেহ নাই।

প্র। কিন্তু মৃগালিনীও ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে।
তবে ত হেমচন্দ্র মৃগালিনীকে ভালবাসিবেই।

উ । বথার্থ । কিন্তু মৃগালিনী অনুশস্থিত, মনোবমা
উপস্থিত ।

এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে
আসিয়া দাঁড়াইল । তথায় একটি গীত আবস্ত করিয়া
কহিল,

“ভিক্ষা দাও গো ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

উপনয়—বহুব্র্যাপ্যো ধূমবান্ ।

গিরিজায়া গীত গায়িল,

“কাহে সই জীষত মবত কি বিধান ?
ব্রজকি কিশোর সই, কাহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ।”

সঙ্গীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল । স্বপ্নশ্রুত
শব্দের স্রায় কর্ণে প্রবেশ করিল ।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

“ব্রজকি কিশোর সই, কাহা গেল ভাগই,
ব্রজবধু টুটায়ল পরাণ ।”

হেমচন্দ্র উন্মুখ হইয়া শুনিতে লাগিলেন ।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

“মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুণ্ডারী ।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বধু কপুকি ভিখাবী ॥”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “এ কি ! মনোবমা, এ যে গিরিক
জায়াব স্বব ! আমি চলিলাম ।” এই বলিয়া তাম্বু দিয়া
হেমচন্দ্র শয্যা হইতে অবতরণ কবিলেন । গিরিজায়া
গায়িতে লাগিল,

“আগে নাহি বুঝলু, রূপ দেখি ভুললু,
অদি বৈলু চরণ যুগল ।
যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গঙ্গল ॥”

হেমচন্দ্র গিরিজায়ায় সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । ব্যস্ত
স্বরে কহিলেন,

“গিরিজায়া ! এ কি, গিরিজায়া ! তুমি এখানে ?
তুমি এখানে কেন ? তুমি এদেশে কবে আসিলে ?”

গিরিজায়া কহিল, “আমি এখানে অনেক দিন আসিয়াছি।” এই বলিয়া আবার গায়িতে লাগিল,

“কিবা কাননবল্লবী, গল বেচি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি এ দেশে কেন এলে?”

গিরিজায়া কহিল, “ভিক্ষা আবার উপজীবিকা।
বাজধানীতে অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছি—

“কিবা কাননবল্লবী, গল বেচি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।”

হেমচন্দ্র গীতে কণপাত না কবিয়া কহিলেন, “মৃগালিনী
কেমন আছে; দেখিয়া আসিয়াছ?”

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

“নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম অপরি,
ছার তনু করব বিনাশ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার গীত বাধ। আঘাৎ
কথাব উত্তর দাও! মৃগালিনী কেমন আছে, দেখিয়া
আসিয়াছ?”

গিরিজায়া কহিল, “মৃগালিনীকে আমি দেখিয়া আসি
নাই। এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্য গীত
গায়িতেছি।”

“এ জনমের সঙ্গে কি সেই জনমেব সাধ ফুরাইবে ।
কিংবা অন্য জন্মার্ধরে, এ সাধ মোব পূর্বািবে ॥”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “গিরিজায়া, তোমাকে মিনতি
কবিতেছি গান রাখ; মৃগালিনীর সংবাদ বল ।”

গি । কি বলিব ?

হে । মৃগালিনীকে কেন দেখিয়া আইস নাই ?

গি । গৌড়নগবে তিনি নাই ।

হে । কেন ? কোথায় গিয়াছেন ?

গি । মথুরায় ।

হে । মথুরায় ? মথুরায় কাহার সঙ্গে গেলেন ? কি
প্রকারে গেলেন ? কেন গেলেন ?

গি । তাঁহার পিতা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক
পাঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন । বৃষ্টি তাঁহার বিবাহ উপস্থিত ।
বৃষ্টি-বিবাহ দিতে লইয়া গিয়াছেন ।

হে । কি ? কি করিতে ?

গি । মৃগালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে
লইয়া গিয়াছেন ।

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন । গিরিজায়া সে মুখ দেখিতে
পাইল না ; আর যে হেমচন্দ্রের স্কন্ধে ফতমুখ ছুটিয়া

বন্ধনবন্ধ রক্তে প্লাবিত হইতেছিল, তাহাও দেখিতে পাইল না । সে পূর্বমত গায়িল,

“বিধি তোরে সাধি পুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আমারে আশ্রয় যেন, রমণী জন্ম দিবে ।
লাজ ভয় তেযাগিব, এসাধ মোর পুবাঈব,
সাগব ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিবে ।”

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন । বলিলেন, “গিরিজায়া,
তোমার সংবাদ শুভ । উত্তম হইয়াছে ।”

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন ।
গিরিজায়া মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল । গিরিজায়া
মনে কবিয়াছিল, মিছা কবিয়া মৃগালিনীর বিবাহের
কথা বলিয়া সে হেমচন্দ্রের পবিত্র কাব্যা দেখিবে ।
মনে কবিয়াছিল যে মৃগালিনীর বিবাহ উপস্থিত হইয়া
হেমচন্দ্র বড় কাতর হইবে, বড় বাগ করিবে । কে তা
ত কিছুই হইল না । এখন গিরিজায়া কপালে করাঘাত
করিয়া ভাবিল, “হায় কি করিলাম ! কেন অনর্থক এ
মিথ্যা রটনা করিলাম ! হেমচন্দ্র ত সুখী হইল দেখিতেছি
—বলিয়া গেল—সংবাদ শুভ । এখন ঠাকুরাণীর দশা
কি হইবে ?” হেমচন্দ্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন,
তোমার সংবাদ শুভ, তাহা, গিরিজায়া ভিখারিণী বৈ

ত নয়—কি বুঝিবে? যে ক্রোধভরে, হেমচন্দ্র, এই মৃগালিনী'ব জন্তু গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্ভূত হইয়া-
ছিলেন, সেই দুর্জয় ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হইল।
অভিমানাধিকো; দুর্দম ক্রোধাবেগে, হেমচন্দ্র গিরি-
জায়াকে বলিলেন, “তোমার সংবাদ শুভ!”

গিবিজয়া তাহা বুঝিতে পারিল না। মনে কবিল
এই ষষ্ঠ লক্ষণ। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না; সেও
ভিক্ষাব প্রতীক্ষা করিল না; “শিকলী কাটিয়াছে”
সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর একটি সংবাদ।

সেই দিন মাধবাচার্য্যের পর্যাটন সমাপ্ত হইল।
তিনি' নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রিয় শিষ্য
হেমচন্দ্রকে দর্শনদান করিয়া চরিতার্থ করিলেন। এবং
আশীর্বাদ, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্নাদির পরে বিরলে উভয়ের
উদ্দেশ্য সাধনের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মাধবা-

চার্য্য কহিলেন, “এত শ্রম কবিয়া কতকদূর কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি। এতদ্দেশে অধীন বাজগণেব মধ্যে অনেকেই বগলক্ষত্রে সসৈন্তে সেন বাজাব সহায়তা কবিত্তে স্বীকৃত হইয়াছেন। অচিরাৎ সকলে আসিয়া নবদ্বীপে সমবেত হইবেন।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাঁহাবা অদ্যই এস্থলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে। যবন-সেনা আসিয়াছে, মহাবনে অবস্থিতি কবিত্তেছে। আধি কালি নগর আক্রমণ কবিলে।”

মাধবাচার্য্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “গোড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে?”

হে। কিছুই না। বোধ হয় বাজসন্নিধানে এ সংবাদ এ পর্য্যন্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কালি, এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মা। এ বিষয় ছুমি বাজগোচর করিয়া সৎপরামর্শ নাও নাই কেন?

হে। সংবাদপ্রাপ্তির পবেই প্ৰাথমধ্যে দক্ষ্য কর্তৃক আহত হইয়া বাজপথে পড়িয়াছিলাম। এই মাত্র গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কবিত্তেছি। বলহানি প্রযুক্ত রাজসমক্ষে যাইতে পারি নাই। এখনই যাইতেছি।

মা । তুমি এখন বিশ্রাম কব । আমি রাজ্যাব নিকট যাইতেছি । পশ্চাৎ যেক্রপ হয় তোমাকে জানাইব । এই বলিয়া মাধবাচার্য্য গাত্রোথান কবিলেন ।

তখন হেমচন্দ্র বলিলেন, “প্রভু । আপনি গোড় পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন শুনিলাম—”

মাধবাচার্য্য অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, “গিয়া-
ছিলাম । তুমি মৃগালিনীর সংবাদ কামনা করিয়া জিজ্ঞাসা
কবিতেছ ? মৃগালিনী তথাষ নাই ।”

হে । কোথাষ গিয়াছে ?

মা । তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে
পারিল না ।

হে । কেন গিয়াছে ?

মা । বৎস ! সে সকল পবিত্র যুদ্ধান্তে দিব ।

হেমচন্দ্র ক্রকুটী কবিধা কহিলেন, “স্বকপ বৃত্তান্ত
আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্ষণীড়ায় কাতর হইব,
সে আশঙ্কা করিবেন না । আমিও কিয়দংশ শ্রবণ
করিয়াছি । যাহা অবগত আছেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে
আমার নিকট প্রকাশ করুন ।”

মাধবাচার্য্য গোড়নগরে গমন করিলে হৃষীকেশ
তাহাকে আপন জ্ঞানমত মৃগালিনীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া-

ছিলেন । তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া মাধবাচার্য্যেবেও বোধ হইয়াছিল ; মাধবাচার্য্য কস্মিন্কালে স্ত্রীজাতির অধ্বাঙ্গী নহেন—সুতরাং স্ত্রীচরিত্র বুদ্ধিতে ন। । এক্ষণে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাহার বোধ হইল যে, হেমচন্দ্র সেই বৃত্তান্তই কতক কতক শ্রবণ করিয়া মৃগালিনীর কামনা পবিষ্ঠ্যাগ করিয়াছেন—অতএব কোন নূতন মনঃপীড়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পুনর্বার আসনগ্রহণ পূর্বক স্বর্ষী-কেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন ।

হেমচন্দ্র অধোমুখে কবতলোঁপরি ক্রকুটিকুটিল ললাট সংস্থাপিত কবিয়া নিঃশব্দে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন । মাধবাচার্য্যেব কথা সমাপ্ত হইলেও বাঙনিষ্পত্তি কুবিলেন না । সেই অবস্থাতেই রহিলেন । মাধবাচার্য্য ডাকিলেন, “হেমচন্দ্র !” কোন উত্তর পাইলেন না । পুনরপি ডাকিলেন, “হেমচন্দ্র !” তথাপি নিরুত্তর ।

তখন মাধবাচার্য্য গাত্রোথান করিয়া হেমচন্দ্রের হস্ত ধাবণ কুবিলেন ; অতি কোমল, স্নেহময় শব্দে কহিলেন, “বৎস ! তাত ! মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও !”

হেমচন্দ্র মুখ তুলিলেন । মুখ দেখিয়া মাধবাচার্য্যও ভীত হইলেন । মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আমার সহিত আলাপ কর । ক্রোধ হইয়া থাকে তাহা ব্যক্ত কর ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “কাহার কথাই বিশ্বাস করিব ?
হৃষীকেশ একরূপ কহিয়াছে। ভিখারিণী আর এক
প্রকার বলিল।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “ভিখারিণী কে ? সে কি
বলিয়াছে ?”

হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

মাধবাচার্য্য সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন, “হৃষীকেশেরই
কথা মিথ্যা বোধ হয়।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “হৃষীকেশের প্রত্যক্ষ।”

তিনি উষ্ণিমা দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে
লইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পাদচারণ
করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছ ?”

হেমচন্দ্র করস্থ শূল দেখাইয়া কহিলেন, “মৃগালিনীকে
এই শূলে বিদ্ধ করিব।”

মাধবাচার্য্য তাঁহার মুখকান্ত দোষয়া ৩৩ হংস
অপসৃত হইলেন।

প্রাতে মৃগালিনী বলিয়া গিয়াছিলেন, “হেমচন্দ্র
আমারই।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

“আমি ত উন্মাদিনী ।”

অপরাত্নে মাধবাচার্য্য প্রত্যাভর্তন করিলেন । তিনি সংবাদ আনিলেন যে ধর্ম্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, যবনসেনা আসিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্কজিত রাজ্যে বিদ্রোহেব সম্ভাবনা শুনিয়া যবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন । আগামী কল্য তাঁহার দূত প্রেরণ করিবেন । দূতের আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন যুদ্ধোদ্যম হইতেছে না । এই সংবাদ দিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, “এই কুলান্ধাব রাজ্যে ধর্ম্মাধিকাৰের বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে ।”

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কি না সন্দেহ । তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য্য বিদায় হইলেন ।

সন্ধ্যার প্রাকালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল । হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোর্বমা কহিল,

“ভাই ! আজ তুমি অমন কেন ?”

হেম । কেমন আমি ?

মনো । তোমার 'মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত
অন্ধকার ; ভাদ্রমাসের গঙ্গাব মত রাগে ভরা ; অত
জ্বলন্ত করিতেছ কেন ? চক্ষুর গ্লানক নাই কেন—
আর দেখি—তাই ত, চোখে জল ; তুমি কেঁদেছ ?

হেমচন্দ্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন ;
আবার চক্ষু অবনত করিলেন ; পুনর্বার উন্নত গবাক্ষপথে
দৃষ্টি করিলেন ; আবার মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া
রহিলেন । মনোবমা বুঝিল যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির
ফোন উদ্দেশ্য নাই । যখন কথা কঠাগত, অথচ বলিবার
নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ হয় । মনোবমা কহিল,

“হেমচন্দ্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ ? কি হইয়াছে ?
হেমচন্দ্র কহিলেন, “কিছু না ।”

মনোরমা প্রথমে কিছু বলিল না—পরে আপনা
আপনি মূহু মূহু কথা কহিতে লাগিল । “কিছু না—
বলিবে না ! ছি ! ছি ! বুকের ভিতরু বিছা পুষিবে !”
বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি
বহিল ;—পরে অকস্মাৎ ‘হেমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া
কহিল, “আমাকে বলিবে না কেন ? আমি যে তোমার
ভগিনী ।”

মনোরমার মুখের ভাবে, শাস্তদৃষ্টিতে এত যত্ন, এত মৃদুতা, এত সহৃদয়তা প্রকাশ পাইল যে হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি কহিলেন, “আমার যে ধন্যতা, তাহা ভগিনীর নিকট কখনীয় নহে।”

মনোরমা কহিল, “তবে আমি ভগিনী নহি।”

হেমচন্দ্র কিছুতেই উত্তর কবিলেন না। তথাপি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া মনোরমা তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। কহিল,

“আমি তোমার কেহ নহি।”

হেম । আমার দুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য—অপরেরও অশ্রাব্য।

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ককণাময়—মৃত্যুস্ত আধিব্যক্তি পবিপূর্ণ ; তাহা মনোরমার প্রাণের ভিতর গিয়া বাজিল। তখনই সে স্বর পরিবর্তিত হইল, নরনে অগ্নিক্ষুলিত্ব নির্গত হইল—অধর দংশন করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমার দুঃখ কি ? দুঃখ কিছুই না। আমি মণি ভ্রমে কালঙ্গাপ কর্ত্তে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।”

মনোরমা আবার পূর্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমেঘ লোচনে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখমণ্ডলে আত্ম মধুব, অতি সকরণ হাস্য প্রকটিক হইল। বালিকা

প্রগল্ভতাপ্রাপ্ত 'হইল। সূর্য্যারশ্মির অপেক্ষা যে রশ্মি
সমুজ্জ্বল, তাহার কিরীট পবিয়া প্রতিভাদেবী দেখা দিলেন।
মনোরমা কহিল, “বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস,
তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।”

হেম। “ভাল বাসিতাম ” হেমচন্দ্র বর্তমানের পবি-
বর্ত্তে অতীতকাল ব্যবহার করিলেন। অমনি নীরবে
নিঃস্রুত অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

মনোবমা বিরক্ত হইল। বলিল, “ছি। ছি!
প্রতারণা! যে পরকে প্রতারণা করে সে বঞ্চক মাত্র।
যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্বনাশ ঘটে।” মনো-
রমা বিবিক্তিবশতঃ আপন অলকদাম চম্পকানুলিতে জড়িত
করিয়া টানিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, “কি প্রতারণা
কবিলাম?”

মনোরমা কহিল, “ভাল বাসিতাম কি? তুমি ভাল-
বাস। নহিলে কাদিলে কেন? কি? আজি তোমার
স্নেহেব পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা
গিয়াছে? কে তোমার এমন প্রবোধ দিয়াছে?” বলিতে
বলিতে মনোবমাব প্রোচভাবাপন্ন মুখকান্তি সহসা প্রফুল্ল
পদ্মবৎ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক হইতে লাগিল, চক্ষু অধিক

জ্যোতিষ্কুৎসু হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর অধিকতর পরিষ্কৃত, আগ্রহকম্পিত হইতে লাগিল ; বলিতে লাগিল, “এ কেবল বীরদন্তকারী পুরুষদের দর্প মাত্র। অহঙ্কার করিয়া আশ্রয় নিবান্, যার? তুমি কালির বাধ দিয়া এই কুলপবিপ্রাবনী গঙ্গার বেগ বোধ কবিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ বোধ কবিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ! মানুষ সকলেই প্রতাবক !”

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, “আমি ইহাকে এক দিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম।”

মনোরমা কহিতে লাগিল, “তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন ; এক দাস্তিক মন্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ কবিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহ স্বরূপ : ইহা জগদীশ্বর-পাদ-পদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যু-ঞ্জয়-জটা-বিহাবিনী ; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে; সেও প্রণয়কে মৃত্যুকে ধাবন করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাস্তিক হস্তী দন্তের অবতাব

স্বরূপ, সে প্রণয়ধেগে ভাসিয়া যায় । প্রণয় প্রথমে এক-
মাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয় ;
প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে শুল্ক হয়—পরিশেষে
লাগিরসঙ্গমে লয়-প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সৰ্বজীবে বিলীন হয় ।”

হে । তোমাব উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের
পাত্রাপাত্র নাই ? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে ?

ম । পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে । প্রণয়েব
পাত্রাপাত্র নাই । সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মি-
লেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেন না প্রণয় অমূল্য ।
ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে ? যেমন, তাকে
যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আনি তাকে বড় ভাল-
বাসি । কিন্তু জামি ত উন্মাদ ।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “মনোরমা, এ
সকল তোমায় কে শিখাইল ? তোমার উপদেষ্টা
অলৌকিক ব্যক্তি ।”

মনোরমা মুখাবনত করিয়া কহিলেন, “তিনি সৰ্ব-
জ্ঞানা, ষকন্তু-”

হে । কিন্তু কি ?

ম । তিনি অগ্নিস্বরূপ --আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও
করেন ।

মনোরমা স্বপ্নে মুখাবনত করিয়া নীরব হইয়া
রহিল ।

হেমচন্দ্র বলিলেন, “মনোরমা, তোমার মুখ দেখিয়া,
আর তোমার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে,
তুমিও ভাল বাসিয়াছ । বোধ হয় যাহাকে তুমি অগ্নিব
সহিত তুলনা করিলে তিনিই তোমাব প্রণয়াদিকারী ।”

মনোরমা পূর্বমত নীরবে রহিল । হেমচন্দ্র পুনরপি
বলিতে লাগিলেন, “যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার
একটি কথা শুন । স্ত্রীলোকের সত্যত্বের অধিক আর
ধর্ম নাই ; ‘যে স্ত্রীর সত্যত্ব নাই, সে শূকবীর অপেক্ষাও
অধম । সত্যত্বের হানি, কেবল কার্য্যেই ঘটে এমন নহে ;
স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সত্যত্বের বিঘ্ন ।
তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপুরুষকে মনেও ভাব, তবে
তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া
থাকিবে । অতএব সঙ্গবধান হও । যদি কাহারও প্রতি
চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও ।”

মনোরমা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল ; পরে মুখে
অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল, হাসি বন্ধ হয় না । হেম-
চন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইলেন, কহিলেন, “হাসিতেছ
কেন ?”

মনোরমা কহিলেন, “ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া
দাঁড়াও ; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে, তুমি পর্বতে ফিরে
যাও ।”

হেম । কেন ?

ম । স্মৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন ? রাজপুত্র, কাল-
সর্পকে মনে করিয়া কি সুখ ? কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে
ভুলিতেছ না কেন ?

হে । তাহার দংশনের আলায় ।

ম । আব সে যদি দংশন না করিত ? তবে কি
তাহাকে ভুলিতে ?

হেমচন্দ্র উত্তর কবিলেন না । মনোরমা বলিতে
লাগিল, “তোমার ফুলের মালা কালসাপ হইয়াছে, তবু
তুমি ভুলিতে পাবিতেছ না ; আমি, আমি ত পাগল
—আমি আমার পুষ্পহার কেন ছিঁড়িব ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি এক প্রকার অজ্ঞান বলিতেছ
না ।” বিস্মৃতি স্বৈচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে ; লোক আত্মগবিমার
অন্ধ হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, ‘তন্মধ্যে
‘বিস্মৃত হও’ এই উপদেশের অপেক্ষা হান্তাম্পদ আর
কিছুই নাই । কেহ কাহাকে বধে না, অর্থচিন্তা ছাড় ;
যশের ইচ্ছা ছাড় ; জ্ঞানচিন্তা ছাড় ; কুধানিবারণেচ্ছা

ত্যাগ কর ; তৃষ্ণানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর ; নিদ্রা ছাড় ; তবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড় ? ভালবাসা কি এ সকল অপেক্ষা ছোট ? এ সকল অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন নহে - কিন্তু ধর্মের অপেক্ষা ন্যূন বটে । ধর্মের জন্ত প্রেমকে সংহার করিবে । জীব পরম ধর্ম সতীত্ব । সেই জন্ত বলিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর ।”

ম । আমি অবলা ; জ্ঞানহীনা ; বিবশা ; আমি ধর্মধর্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না । * আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না ।

হে । সাবধান, মনোবমা ! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে ; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম জন্মে । তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে । তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্মে একেব পত্নী, মনে অত্রের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না ?

গৃহমধ্যে হেমচন্দ্রের অসিচর্ম্ব বুলিতেছিল ; মনোরমা চর্ম্ব হস্তে লইয়া কহিল, “ভাই, হেমচন্দ্র, তোমার এ ঢাল কিসের চামড়া ?”

হেমচন্দ্র হাস্য করিলেন । মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

-০০-

গিরিজায়ার সংবাদ ।

গিরিজায়া যখন পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্তন 'কবে, তখন প্রাণান্তে 'হেমচন্দ্রের নবানুবাগেব কথা মৃগালিনীর সাক্ষাতে ব্যক্ত 'করিবে না স্থিব' করিয়াছিল। মৃগালিনী তাহার আগমন প্রতীক্ষায় পিঞ্জরে বদ্ধ বিহ্বলী 'গ্রাস চঞ্চলা হইয়া রহিয়াছিলেন ; 'গিরিজায়াকে দেখিবুমাত্র 'কহিলেন, "বলু গিবিজায়া, কি' দেখিলে ? হেমচন্দ্র কেমন আছেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "ভাল আছেন।"

মৃ। কেন, অমন করিয়া বলিলে কেন ? তোমার কথায় উৎসাহ নাই কেন ? যেন দুঃখিত হইয়া বলিতেছ ; কেন ?

গি। সে কি ?

মৃ। গিরিজায়া আমাকে প্রতারণা করিও না ; হেমচন্দ্র কি ভাল, হয়েন নাই, তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। সন্দেহের অপেক্ষা প্রীতি ভাল।

গিরিজায়া এবাব সহাশ্রে কহিল, “তুমি কেন অনর্থক ব্যস্ত হও। আমি নিশ্চিত বলিতেছি তাঁহার শরীবে কিছুই ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।”

মৃগালিনী ক্ষণেক চিন্তা কবিয়া কহিলেন, “মনোরমার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্তা শুনিলে ?”

গি। শুনলাম।

মৃ। কি শুনিলে ?

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা কহিলেন। কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে যে মনোরমা নিশা পর্যটন করিয়াছিলেন ও কাণে কাণে কথা বলিয়াছিলেন, এই দুইটি বিষয় গোপন করিলেন। মৃগালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ ?”

গিরিজায়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “করিয়াছি।”

মৃ। তিনি কি কহিলেন ?

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মৃ। তুমি কি বলিলে ?

গি। আমি বললাম, তুমি ভাল আছ।

মৃ। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ ?

গি। না।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিতেছ।

তোমার মুখ শুকন। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না ; আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস ফবিতে পারিতেছি না। যাহা থাকে অদৃষ্টে, আমি স্বয়ং হেমচন্দ্রকে দেখিতে যাইব। পাব, আমার সঙ্গে আইস, নচেৎ আমি একাকিনী যাইব।

এই বলিয়া মৃগালিনী অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বেগে রাজপথ স্নতিবাহন করিয়া চলিলেন।

গিরিজায়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইল। কিছুদূর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধবিয়া কহিল, “ঠাকুরাণি, ফের ; আমি যাহা লুকাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।”

মৃগালিনী গিবিজায়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গিরিজায়া যাহা যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

গিবিজায়া হেমচন্দ্রকে ঠকাইয়াছিল। কিন্তু মৃগালিনীকে ঠকাইতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

মৃগালিনীর লিপি ।

মৃগালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া থাকিবেন, ‘উত্তম হইয়াছে’ ; ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না করিবেন ?”

গিরিজায়াও তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, “ইহা সম্ভব বটে ।”

তখন মৃগালিনী কহিলেন, “তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই। এর বিহিত করা উচিত ; তুমি আহারাদি করিতে যাও। আমি ততক্ষণ একখানি পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি থাইবার পর, সেইখানি লইয়া তাঁহার নিকট যাইবে ।”

গিরিজায়া স্বীকৃতা হইয়া সস্তর আহারাদির জন্ত গমন করিল। মৃগালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন ।

লিখিলেন,

“গিবিজায়া মিথ্যাবাদিনী । যে কাবনে সে তোমার নিকট মৎসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বয়ং বিস্তারিত কবিতা করিবে । আমি মথুরায় যাই নাই । যে বাত্রিতে তোমার অক্ষুবীর্য দেখিয়া যমুনা তটে আসিয়াছিলাম, সেই বাত্রি অবধি আমার পক্ষে মথুরাব পথ বন্ধ হইয়াছে । আমি মথুরায় না গিয়া তোমাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছি । নবদ্বীপে আসিয়াও যে এ পর্য্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার এক কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে । আমার অভিলাষ তোমাকে দেখিব, তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্যিক কি ।”

গিবিজায়া •এই লিপি লইয়া পুনৰ্য্যাপ হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল । সন্ধ্যাকালে, মনোবম্বার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গাদর্শনে ফাইতেছিলেন, পথে গিবিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল । গিবিজায়া তাঁহাকে হস্তে লিপি দিল ।

হেমচন্দ্র করিলেন, “তুমি আবার কেন ?”

গি। পত্র লইয়া আসিয়াছি ।

হে। পত্র কাহার ?

গি। মৃগালিনীর পত্র ।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, “এ পত্র কি প্রকারে তোমার নিকট আসিল ?”

গি। শূণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মথুরার কথা আপনাব নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হে। এই পত্র তাহাব ?

গি। হাঁ তাহাব স্বহস্তলিখিত।

হেমচন্দ্র লিপিখানি না পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবিলেন। ছিন্নখণ্ড সকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন,

“তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্বেই শুনিতে পাঠিয়াছি। তুমি যে ছুষ্টার পত্র লইয়া আসিয়াছ। সে যে বিবাহ কবিত্তে যার নাই, জ্বীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্বেই শুনিয়াছি। আমি কুলটাব পত্র পড়িব না। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।”

শিরিজায়া চমৎকৃত হইয়া নিরুত্তবে হেমচন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র পথিপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া হস্তে লইয়া কহিলেন, “দূর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।”

গিরিজায়ার আর সহ হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, “বীর পুরুষ বটে! এই বকম বীৰ্য প্রকাশ করিতে বৃদ্ধি নদীয়ার এসেছে? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে! মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিবদুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।”

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু গিরিজায়ার রাগ গেল না। বলিল, “তুমি মৃগালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃগালিনী দূরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও।”

এই বলিয়া গিরিজায়া, সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। ‘হেমচন্দ্র’ ভিখারিণী বর্ক দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

গিরিজায়া প্রত্যাগতা হইয়া হেমচন্দ্রের আচরণ মৃগালিনীর নিকট সন্নিবেশ বিবৃত করিল। এবার কিছু লুকাইল না। মৃগালিনী শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন, সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। দেখিয়া গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল—তখন মৃগালিনীর কথোপকথনের সময় নহে বৃদ্ধি তথা হইতে সরিয়া গেল।

পাটনীর গৃহের অনতিদূরে যে এক সোপানবিশিষ্ট, পুষ্করিণী ছিল, তথায় গিয়া গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল। শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কোমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাম্বু, অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া প্রভাসিত হইতেছিল। তদুপরি স্পন্দনরহিত কুমুমশ্রেণী অর্ধপ্রক্ষুটিত হইয়া নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল ; চারিদিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরস্পরান্নিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দেশ করিতেছিলেন ; কচিৎ দুই একটি দীর্ঘ শাখা উল্লেখিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জমধ্য, হইতে নবক্ষুট-কুমুমসৌরভ আসিতোছিল। গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল।

গিরিজায়া প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিল—যেন নবশিক্ষিতা বিহঙ্গী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহাব স্বর স্পষ্টতা লাভ করিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, শেষে সেই সঙ্কীর্ণসম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কণ্ঠধ্বনি, পুষ্করিণী, উপবন, আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গ-চ্যুত স্বরসরিত্তরঙ্গ স্বরূপ মৃগালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। গিরিজায়া গায়িল ;—

“পবান না গেলো ।

যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুল্লর ধীবে ধীবে,
ওঁ হি পব পির সই, কাহে কালো নীরে,
জীবন না গেলো ?”

কিবি ঘর আরনু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীবে আপনা আচোলি,
রোই বোই পির সই কাহে লো পরাপি,
তইখন না গেলো ?

শুননু শ্রবণ পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে বাধে বাধে বিপিন মাঝে ;
যব শুননু লাগি সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো ?

ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপদমূলে,
সোহি পদমূলে বউ, কাহে লো হামারি,
মরণ না ভেল ?”

গিরিজায়া গায়িতে গায়িতে দেখিলেন, তাঁহার
সম্মুখে চন্ডের কিরণোপরি মনুষ্যের ছায়া পড়িয়াছে ।
ফিরিয়া দেখিলেন, মৃগালিনী দাঁড়াইয়া আছেন । তাঁহার
মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মৃগালিনী কাঁদিতেছেন ।

গিরিজায়া দেখিয়া হর্ষান্বিত হইলেন, — তিনি বুঝিতে
পারিলেন যে যখন ‘মৃগালিনীর চক্ষুতে জল আসিয়াছে—

তখন তাঁহার ক্রোশে কিছু শমতা হইয়াছে। ইহা সকলে বুঝে না—মনে করে “কই, ইহাব চক্ষুতে ত জল দেখিলাম না, তবে ইহার কিসের দুঃখ ?” যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্ষপীড়াই না জানি নিবারণ হইত ।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল ! মৃগালিনী কিছু বলিতে পারেন না ; গিরিজায়াও কিছু জিজ্ঞাসা কবিত্তে পারে না । পবে মৃগালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, আব একবার তোমাকে যাইতে হইবে ।”

গি। আবার সে পাষণ্ডেব নিকট যাইব কেন ?

মৃ। পাষণ্ড বলিও না । হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন—এ সংসারে, অভ্রান্ত কে ? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন । আমি স্বয়ং তাঁহাব নিকট এখনই যাইব—তুমি সঙ্গে চল । তুমি আমাকে ভগিনীব অধিক স্নেহ কব—তুমি আমাব জন্ত না কবিয়াছ কি ? তুমি কখনও আমাকে অকারুণে মর্ষপীড়া দিবে না—কখনও আমার নিকটে এ সকল কথা মিথ্যা রুবিয়া বলিবে না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি । কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হেমচন্দ্র আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ কবিলেন, ইহা তাঁহাব মুখে না শুনিয়া কি প্রকাবে অন্তঃকরণকে স্থির কবিত্তে পারি ? যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি

মৃগালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ
বিসর্জন করিতে পারিব ।

শি । প্রাণবিসর্জন ! সে, কি মৃগালিনি ?

মৃগালিনী কোন উত্তর করিলেন না । গিরিজায়ার
স্কন্ধে বাহুস্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।
গিরিজায়াও রোদন কবিল ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

অমৃত গবল — গরসামৃত ।

হেমচন্দ্র, "আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস কবিয়া মৃগা-
লিনীকে দুশ্চরিত্রা বিনেচনা করিয়াছিলেন ; মৃগালিনীর
পত্র পাঠ না করিয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন,
তাহার দূতীকে বেত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ।
কিন্তু ইহা বদ্বিয়া তিনি মৃগালিনীকে ভাল বাসিতেন না,
তাহা নহে । মৃগালিনীর জন্ত তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া
মথুরাবাসী হইয়াছিলেন । এই মৃগালিনীর জন্ত গুরুব
প্রতি শরসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মৃগালিনীর
জন্ত গোড়ে নির্জ ব্রত বিস্মৃত হইয়া ভিখারিণীর তোষা-

মোদ করিয়াছিলেন । আর এখন ? এখন হেমচন্দ্র মাধবা-
চার্য্যাকে শূল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “মৃণালিনীকে এই
শূলে বিদ্ধ কবিব !” কিন্তু তাই বলিয়া কি, এখন তাঁহার
স্নেহ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ? স্নেহ কি এক-
দিনে ধ্বংস হইয়া থাকে ? বহুদিন অবধি পার্শ্বতীয় বারি
পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ নিখাত
করে, একাদিনেব সূর্য্যোত্তাপে কি সে নদী শুকায় ?
জলেব যে পথ নিখাত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাইবে ;
সে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে । হেমচন্দ্র
সেই বাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে, শয্যোপবি, শয়ন করিয়া সেই
মুক্ত বাতায়নসন্নিধানে, মস্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে দৃষ্টি
কবিত্তেছিলেন—তিনি কি নৈশ শোভা দৃষ্টি করিত্তে
ছিলেন ? যদি তাঁহাকে সে সন্ময় কেহ জিজ্ঞাসা করিত্ত
যে, রাত্রি সজ্জ্যাৎনা কি অন্ধকার, তাহা তিনি তখন
সহসা বলিত্তে পারিত্তেন না । তাঁহার হৃদয় মধ্যে যে
রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিত্তে-
ছিলেন । সে রাত্রি ত তখনও সজ্জ্যাৎনা ! নহিলে তাঁহার
উপাধান আর্দ্র কেন ? কেবল মেধোদয় মাত্র । যাহার
হৃদয়-আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে বোদন
করে না ।

যে কখনও রোদন কবে নাই, সে মনুষ্য মধ্যে অধম । তাহাকে কখনও বিশ্বাস কবিও না । নিশ্চিত জানিও সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরেব সুখও কখনও তাহার সহ্য হয় না । এমন হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তজয়ী মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃ-পীড়া সকল সহ্য করিতেছেন, এবং কবিতা থাকেন ; কিন্তু তিনি যদি কখনো কালে, এক দিন বিরলে একবিন্দু অশ্রু-জলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে শাবেন, কিন্তু আমি ববং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে ।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্য, বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহার জন্ত রোদন কবিতেছিলেন । মৃগালিনীর কি তিনি দোষ আলোচনা করিতেছিলেন? তাহা কবিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেবল তাহাই নহে । এক একবার মৃগালিনীব প্রেমপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপরিপূর্ণ কার্য সকল মনে করিতেছিলেন । সেই মৃগালিনী কি অবিশ্বাসিনী? একদিন মথুরায় হেমচন্দ্র মৃগালিনীর নিকট একখানি লিপি প্রেরণ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত বাহক পাইলেন না ; কিন্তু মৃগালিনীকে গবাক্ষ-

পথে দেখিতে পাইলেন । তখন হেমচন্দ্র একটি অম্র-ফলের উপরে আবশ্যিক কথা লিখিয়া মৃগালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য কবিয়া বাতায়নপথে শ্বেয়ণ কবিলেন ; অম্র ধবিবার জন্ত মৃগালিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসাতে অম্র মৃগালিনীর ক্রোড়ে না পড়িয়া তাঁহার কণে লাগিল, অমনি তদাঘাতে কর্ণবিলম্বী বহুকুণ্ডল কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাটিয়া পড়িল, কর্ণক্রত রুধিবে মৃগালিনীব গ্রীবা ভাসিয়া গেল। মৃগালিনী ক্রক্ষেপও করিলেন না ; কণে হস্তও দিলেন না ; হাসিয়া অম্র তুলিয়া লিপি পাঠপূর্বক, তখনই তৎপৃষ্ঠে প্রত্যুত্তর লিখিয়া • অম্র প্রতিপ্রেবণ করিলেন • এবং যতক্ষণ হেমচন্দ্র দৃষ্টিপথে বহিলেন, ততক্ষণ বাতায়নে থাকিয়া হৃদয়মুখে দেখিতে লাগিলেন । হেমচন্দ্রের তাহা মনে পড়িল । সেই মৃগালিনী কি অবিদ্বাসিনী ? ইহা • সম্ভব নহে । আব একদিন মৃগালিনীকে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল । তাহাব যন্ত্রণায় মৃগালিনী মুমূর্ষু বৎ কাতর হইয়াছিলেন । তাঁহার এক জন পরিচারিকা তাহার উত্তম ঔষধ জানিত ; তৎপ্রয়োগ মাত্র যন্ত্রণা একেবাবে শীতল হয় ; দাসী শীঘ্র ঔষধ আনিতে গেল । ইত্যবসরে হেমচন্দ্রের দূতী গিয়া

কহিল যে, হেমচন্দ্র উপবনে তাঁহার প্রতীক্ষা কবিতেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঔষধ আসিত, কিন্তু মৃগালিনী তাহার অপেক্ষা করেন নাই; অমনি সেই মরণাধিক বহুণা বিস্মৃত হইয়া উপবনে উপস্থিত হইলেন। আর ঔষধ প্রয়োগ হইল না। হেমচন্দ্রের তাহা স্বরণ হইল। সেই মৃগালিনী ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক ব্যোমকেশের জন্ম হেমচন্দ্রের কাছে অবিখ্যাসিনী হইবে? না, তা কখনই হইতে পারে না। আব একদিন হেমচন্দ্র মথুবা হইতে গুরুদর্শনে যাইতেছিলেন, মথুবা হইতে এক প্রহরেব পথ আসিয়া হেমচন্দ্রের পীড়া হইল। তিনি এক পাহুনিবাসে পড়িয়া বহিলেন, কোন প্রকারে এ সংবাদ অন্তঃপূবে মৃগালিনীর কর্ণে প্রবেশ কবিল। মৃগালিনী সেই বাত্রিতে এক ধাত্রীমাত্র সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে সেই এক যোজন পথ পদব্রজে অতিক্রম কবিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। যখন মৃগালিনী পাহুনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পথশ্রান্তিতে প্রায় নিঃস্রীব; চরণ ক্রম বিকৃত,--কুধর বহিতেছিল। সেই রাত্রিতেই মৃগালিনী পিতার ভয়ে প্রত্যাভর্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি স্বয়ং পীড়িতা হইলেন। হেমচন্দ্রের তাহাও মনে পড়িল। সেই মৃগালিনী নরাদম ব্যোমকেশের জন্ম

তাঁহাকে ত্যাগ করিবে ? সে কি 'অবিশ্বাসিনী' হইতে পাবে ? যে এমন কথায় বিশ্বাস করবে, সেই অবিশ্বাসী— সে, নবধর্ম, সে গণ্ডমূর্গ। হেমচন্দ্র শতবার ভাবিতে-ছিলেন, “কেন আমি মুংগালিনীর পত্র পড়িলাম না ? নবদ্বীপে কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না ?” পত্রখণ্ডগুলি যে বনে নিষ্কিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা যদি সেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহা যুক্ত করিয়া যতদূর পাবেন, ততদূর মর্শ্যাবগত হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া একবার সেই বন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন ; কিন্তু সেখানে বনতলস্থ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পারেন নাই। বায়ু লিপিকণ্ড সকল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। যদি তখন আপন দক্ষিণ বাহু ছেঁদন করিয়া দিলে হেমচন্দ্র সেই লিপিকণ্ডগুলি পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র তাহাও দিতেন।

আবার ভাবিতেছিলেন, “আচার্য্য কেন মিথ্যা কথা বলিবেন ? আচার্য্য অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ—কখনও মিথ্যা বলিবেন না। বিশেষ আমাকে পুঞ্জাধিক স্নেহ করবেন—জানেন, এ সংবাদে আমার মূবণাধিক যত্নগা হইবে, কেন আমাকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া এত যত্নগা দিবেন ? আর তিনিও স্বেচ্ছাক্রমে এ কথা বলেন নাই। আমি সদর্পে

তাঁহার নিকট কথা বাহিব কবিয়া লইলাম—যখন আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগত আছি—তখনই তিনি কথা বলিলেন । মিথ্যা বলিবাব উদ্দেশ্য থাকিলে, বলিতে অনিচ্ছুক হইবেন কেন ? তবে হইতে পারে ক্রমীকেশ তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকিবে । কিন্তু ক্রমীকেশই বা অকারণে গুরুব নিকট মিথ্যা বলিবে কেন ? আব মৃগালিনীই বা তাহার গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিবে কেন ?”

যখন এইরূপ ভাবেন, তখন হেমচন্দ্রের মুখ কালিমা-
ময় হয়, ললাট ঘৃণসিক্ত হয় ; তিনি শয়ন ত্যাগ কবিয়া
উঠিয়া বসেন ; দন্তে অধর দংশন কবেন, লোচন আঁবক্ত
এবং বিস্ফারিত হয় ; শূলধারণ জন্ত হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয় ।
আবাব মৃগালিনীব প্রেমময় মুখমণ্ডল মূনে পড়ে । অমনি
ছিন্নমূল বৃক্ষের আয় শয্যার পতিত হইলেন ; উপাধানে
মুখ লুক্কায়িত কবিয়া শিশুর আয় রোদন কবেন । হেম-
চন্দ্র এইরূপ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার
শয়নগৃহের দ্বার উদঘাটিত হইল । গিরিজারা প্রবেশ
করিল ।

হেমচন্দ্র প্রথমে মনে কবিলেন, মনোরমা । তখনই
দেখিলেন, সে কুসুমময়ী মূর্তি নহে । পরে চিনিলেন যে,

গিরিজায়া : প্রথমে বিস্মিত, পরে, আফ্লাদিত, শেষে কোতূহলাক্রান্ত হইলেন । বলিলেন, “তুমি আবার কেন?”

গিরিজায়া কহিল, “আমি মৃগালিনীর দাসী । মৃগালিনীকে আপনি ত্যাগ কবিয়াছেন । কিন্তু ‘আপনি মৃগালিনীর’ ত্যাজ্য নহেন । সুতবাং আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে । আমাকে বেত্রাঘাত কবিত্তে সাধ থাকে, করুন । ঠাকুবাণীর জন্ত এবার তাহা সহিব, স্থিব সঙ্কল্প কবিয়াছি ।”

এ তিবন্ধাবে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন । বলিলেন, “তোমার কোন শঙ্কা নাই । স্ত্রীলোককে আমি মাঝে না । তুমি কেন আসিয়াছ ? মৃগালিনী কোথায় ? বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন, নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন ? আমি ঠাহার পত্র না পড়িয়া ভাল করি নাই ।”

গি । মৃগালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন ।

হেমচন্দ্রের শব্দাব কণ্টকিত হইল । এই মৃগালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন ? তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, “মৃগালিনী কোথায় আছেন ?”

গি । তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায়

লইতে আসিয়াছেন । সরোবর-তীরে দাঁড়াইয়া আছেন ।
আগনি আসুন ।

এই বলিয়া গিরিজায়া চলিয়া গেল । হেমচন্দ্র তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ।

গিরিজায়া বাপীতীরে, যথায় মৃগালিনী 'সোপানো-
পরি' বসিয়াছিলেন, তথায় উপনীত হইল । হেমচন্দ্রও
তথায় আসিলেন । গিরিজায়া কহিল, "ঠাকুবাণী !
উঠ । রাজপুত্র আসিয়াছেন ।"

মৃগালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন । উভয়ে উভয়েই মুখ
নিরীক্ষণ করিলেন । মৃগালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল ; অশ্রু-
জলে চক্ষু পূরিয়া গেল । অবলম্বনশাখা ছিন্ন হইলে
যেমন শাখাবিলম্বিনী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃগালিনী
সেইরূপ হেমচন্দ্রেই পদমূলে পতিত হইলেন । গিরিজায়া
অন্তরে গেল ।

দশম পরিচ্ছেদ :

— ০০ —

এত দিনের পর !

হেমচন্দ্র মৃগালিনীকে হস্তে ধরিয়া তুলিলেন। উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

এত কাল পবে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। যে দিন প্রদোষকালে, যমুনার উপকূলে, নৈদাঘানিলসস্তাড়িত বকুলমূলে দাঁড়াইয়া, নীলাম্বুময়ীর চঞ্চল-তরঙ্গ শিবে নক্ষত্রশির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে কবিত্তে উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাব পর এই সাক্ষাৎ হইল। নিদাঘের পর বর্ষা গিয়াছে, বর্ষার পর শরৎ যায়, কিন্তু ইহাদের হৃদয় মধ্যে যে কত দিন গিয়াছে, তাহা কি ঋতুগণনায় গণিত হইতে পারে ?

সেই নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা বাপীতীরে, দুই জনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে, সেই নিবিড় বন, ঘনবিঘ্নস্ত লতাস্রগ্বিশোভী বিশাল বিটপী সকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; সম্মুখে নীল-

নীরদধগুবৎ দীর্ঘিবাগ শৈবাল কুমুদ কঙ্কার সহিত বিস্তৃত
 রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ
 আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক—আকাশে, বৃক্ষ-
 শিবে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজলে—সর্বত্র
 হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা, ধৈর্যময়ী। সেই
 ধৈর্যময়ী প্রকৃতির প্রসাদমধ্যে, মৃগালিনী হেমচন্দ্র মুখে
 মুখে দাড়াইলেন।

ভাষায় কি শব্দ ছিল না? তাঁহাদিগেব মনে কি
 বলিবাব কথা ছিল না? যদি মনে বলিবাব কথা ছিল,
 'ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না? তখন
 চক্ষুর দেখাতেই মুন উন্মত্ত—কথা কহিবৈ কি প্রকাবে?
 এ সময় কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকটে অবস্থিতিতে এত
 সুখ যে, হৃদয়মধ্যে অণু সুখের স্থান থাকে না। যে সে
 সুখভোগ করিতে থাকে, সে আর কথার সুখ বাসনা
 করে না।

সে সময়ে এত কথা বলিবার থাকে যে, কোন কথা
 আগে বলিব তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না।

মনুষ্যভাষায় এমন কোন শব্দ আছে যে, সে সময়ে
 প্রযুক্ত হইতে পারে?

তাঁহারো পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র মৃগালিনীর সেই প্রেমময় মুখ আবার দেখিলেন — স্রীকেশবাক্যে প্রত্যয় দূর হইতে লাগিল। সে গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তা পন্ডিততা লেখা আছে। হেমচন্দ্র তাঁহাব লোচন প্রতি চাহিয়া রহিলেন, সেই অপূর্ব আয়তনশালী, ইন্দীবন-নিন্দী অন্তঃকরণের দর্পণরূপ চক্ষুঃপ্রতি চাহিয়া রহিলেন — তাহা হইতে কেবল প্রেমাশ্রু বহিতেছে! — সে চক্ষু যাহার, সে কি অবিশ্বাসিনী!

হেমচন্দ্র প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা কবিলেন, “মৃগালিনী! কেমন আছ?”

মৃগালিনী উত্তর কবিত্তে পাবিলেন না। এখনও তাঁহাব চিত্ত শান্ত হইয়া নাই; উত্তরের উপক্রম কবিলেন, কিছু আবার চক্ষুব জলে ভাসিয়া গেল। কণ্ঠ ক্লক্ ‘হইল, কথা সরিল না।

হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি কেন আসিয়াছ?”

মৃগালিনী তাপাি উত্তর কবিত্তে পাবিলেন না। হেমচন্দ্র তাঁহাব হস্ত ধারণ কব্বিয়া সোপানোপবি বসাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন, মৃগালিনীর যে কিছু চিত্তের স্থিরতা ছিল এই আদবে তাহার লোপ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মুস্তক আপনি আসিয়া হেমচন্দ্রের স্বক্কে

স্থাপিত হইল, মৃগালিনী তাহা জানিয়াও জানিতে পাবিলেন না। মৃগালিনী আবার রোদন কবিলেন—
তাঁহার অশ্রুজলে হেমচন্দ্রের স্কন্ধ, বক্ষঃ প্রাবিত হইল। এ
সংসাবে মৃগালিনী যত সুখ অনুভূত কবিয়াছিলেন, তন্মধ্যে
কোন সুখই এই বোদনের তুল্য নহে।

হেমচন্দ্র আবার কথা কহিলেন, “মৃগালিনি। আমি
তোমার নিকট গুরুতব অপবাধ কবিয়াছি। সে অপরাধ
আমার ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক বটনা
কুনিয়া তাহা বিশ্বাস কবিয়াছিলাম। বিশ্বাস কবিবার কতক
কারণও ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি দূব করিতে পাবিবে।
বাহা আমি জিজ্ঞাসা কবি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও।”

মৃগালিনী হেমচন্দ্রের স্কন্ধ হইতে মস্তক না তুলিয়া
কহিলেন, “কি?”

হেমচন্দ্র বলিলেন, “তুমি হৃষীকেশের গৃহত্যাগ করিলে
‘কেন?’

‘ঐ নাম শ্রবণমাত্র কুপিতা ফণিনীর স্ত্রী মৃগালিনী
মাথা তুলিল। কহিল, “হৃষীকেশ আমাকে গৃহ হইতে
বিদায় করিয়া দিয়াছে।”

হেমচন্দ্র ব্যথিত হইলেন—অল্প সন্দেহান হইলেন—
কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। এই অবকাশে মৃগালিনী

পুনর্বপি হেমচন্দ্রের স্কন্ধে মস্তক বাখিলেন । সে সুখাসনে শিবোরক্ষা এত সুখ যে, মৃগালিনী তাঁহাতে বন্ধিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না ।

হেমচন্দ্র, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন তোমাকে হৃষীকেশ গৃহবহিস্কৃত কবিয়া দিল ?”

মৃগালিনী হেমচন্দ্রের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইলেন । অতি মৃদুববে কহিলেন, “তোমাকে কি বলিব ? হৃষীকেশ আমাকে কুণ্ডটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে ।”

শ্রুতমাত্র তাঁবের গায় হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন । মৃগালিনী মস্তক তাঁহাকে বক্ষশ্যুত হইয়া সোপানে আহত হইল ।

“পাপীয়সি—নিজমুখে স্বীকৃতা হইলি!” এই কথা দন্তুমধ্য হইতে স্কন্ধ করিয়া, হেমচন্দ্র বেগে প্রশ্রান করিলেন । পথে গিবিজ্ঞায়াকে দেখিলেন ; গিরিজায়া তাঁহার সজলঙ্গলদভীম মূর্তি দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল । লিখিত লজ্জা কবিতেকে—কিন্তু না লিখিলে নয়—হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিবিজ্ঞায়াকে পথ হইতে অপসৃতা করিলেন । বলিলেন, “তুমি যাহার দূতী, তাহাকে পদাঘাত কবিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত ।” এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন ।

• যাহাব বৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের 'জন্মমাত্র' অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত । কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, কেবল অধৈর্য্য মাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ জৌগাচার্য্যের নিপাত হইয়াছিল । "অশ্বখামা হতঃ" এই শব্দ শুনিয়া তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করিলেন । প্রশান্তব দ্বারা সবিশেষ তত্ত্ব লইলেন না । হেমচন্দ্রের কেবল অধৈর্য্য নহে—অধৈর্য্য, অভিমান, ক্রোধ ।

শীতল সমাবগময়ী উষার পিকল মূর্ত্তি বাপীতোর-বনে উদয় হইল । তখনও মৃগালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন । গির্জায়া জিহ্বাসা করিল,

“ঠাকুরাণী, আঘাত কি গুরুতব বোধ হইতেছে ?”

• মৃগালিনী কহিলেন, “কিসেব আঘাত ?”

গি । মাথায় ।

• মৃ । মাথায় আঘাত ? আমার মনে হয় না ।



ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ।

—000—



চতুর্থ খণ্ড ।

—000—

• প্রথম পরিচ্ছেদ ।

—00—

“ উর্গনাভনা ”

যতক্ষণ মৃগালিনীর সুখেব তাবা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গোডদেশের সোভাগ্যশর্মাও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গোড় রাখিতে পারিত, সে উর্গনাভেব ঞায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বন্ধ করিবার জন্য জ্বল পাতিতেছিল। নিশীথ সময়ে নিভূতে বসিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি, নিজ দক্ষিণহস্তস্বরূপ শাস্তুশীলকে ভৎসনা করিতেছিলেন, “শাস্তুশীল ! ” প্রাতে যে সংবাদ

দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র ।
তোমার প্রতি আর কোন ভার দিবার ইচ্ছা নাই ।”

শান্তীশীল কহিল, “যাহা অসাধ্য, তাহা পাবি নাই ।
অন্যকার্য্যে পরিচয় গ্রহণ করুন ।”

প । মৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে ?

শা । এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ
না সাজে ।

প । প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ
দেওয়া হইয়াছে ?

শা । এই বলিয়া দিয়াছি যে, অচিরে যবন-সুমাত্রাটের
নিকট হইতে কব লইয়া কয়জন যবন দূতস্বরূপ আসিতেছে,
তাহাদিগের গতিবোধ না করে ।

প । দামোদর শর্মা উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন
কি না ?

শা । তিনি বড় চতুরের স্থায় কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিয়া-
ছেন ।

প । সেক প্রকার ?

শা । তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র
পরিবর্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি
বসাইয়াছিলেন । তাহা লইয়া ঋণ প্রাপ্ত রাজাকে

শ্রবণ করাইয়াছেন এবং মাধবচাৰ্য্যেব অনেক নিন্দা করিয়াছেন ।

* প। কবিতায়, ভবিষ্যৎ গোড়বিজেতার কপবর্ণনা সবিস্তারে লিখিত আছে । সে বিষয়ে মহারাজ কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ?

শ। কবিয়াছিলেন । মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদে মহারাজ অবগত আছেন । মহারাজ কবিতায় ভবিষ্যৎ গোড়বিজেতার অবয়ব বর্ণনা শুনিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন । মদনসেন উপস্থিত হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কেমন, তুমি মগধে যবন-বাজ প্রতিনিধিকে দেখিয়া আসিয়াছ ?” সে কহিল “আসিয়াছি ।” মহারাজ তখন আজ্ঞা কবিলেন, “সে দেখিতে কি প্রকাৰ বিবৃত কর ।” তখন মদনসেন বখতিয়ার খিলজির যথার্থ যে রূপ দেখিয়াছেন, তাহাই বিবৃত কবিলেন । কবিতাতেও সেইরূপ বর্ণিত ছিল । সুতরাং গোড়বিজয় ও তাহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলেন ।

* প। তাহার পব ?

শ। রাজা তখন রোদন করিতে লাগিলেন । কহিলেন, “আমি এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিব ? সপরিবাবে

যখনই প্রাণে নষ্ট হইবে দেখিতেছি!” তখন দামোদর শিক্ষামত কহিলেন, “মহারাজ! ইহাব সদুপায় এই যে, অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্ম্মাধিকারের প্রতি রাজকাৰ্য্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা হইলে আপনার শরীর বক্ষা হইবে। পবে শান্তি মিথ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।” রাজা এ পৰামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ কবিয়াছেন। অচিরেই সপরিবারে তীর্থযাত্রা কবিবেন।

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার মনঃকামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত শাস্ত্র স্বাধীন রাজা না হই, যখন রাজ-প্রতিনিধি হইবে। কার্য্যসিদ্ধি হইলে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পূবস্কৃত করিতে ক্রটি করিব না, তাহা ত জান। এক্ষণে বিদায় হও। কাল প্রাতেই যেন তীর্থযাত্রার জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকে।

শান্তিল বিদায় হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—00—

বিনা সূতার হার ।

পশুপতি উচ্চ অট্টালিকায় বহুভূত্যা সমভিব্যাহাবে বাস কবিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রী কানন হইতেও অন্ধকার। গৃহ বাহাতে আলো হুয়, স্ত্রী পুত্র পবিবার—এ সকলই তাঁহার গৃহে ছিল না।

অন্য শাস্ত্রশীলের সচিত্র কথোপকথনেব পর, পশুপতিব সেই সকল কথা মনে পড়িল। মনে ভাবিলেন, “এত কালের পব বুঝি এ অন্ধকার পুত্রী আলো হইল—যদি জগদম্বা অনুকূলা হইয়েন, তবে মনোবমা এ অন্ধকার ঘুচাইবে।”

এইকপ ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি, শয়নেব পূর্বে অষ্টভুজাকে নিয়মিত প্রণামবন্দনাদির জন্তু দেবীমন্দিবে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তথায় মনোরমা বসিয়া আছে :

পশুপতি কহিলেন, “মনোবমা, কখন আসিলে ?”

মনোবমা পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া বিনাসূত্রে

মালা গাঁথিতেছিল। ফথার কোন উত্তর দিল না। পশুপতি কহিলেন, “আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যজ্ঞা বিস্মৃত হই।”

মনোবমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, “আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমাব মনে হইতেছে না।”

পশুপতি কহিলেন, “তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা করিতেছি।”

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, “আমারও কিছু বলিবার আছে, মনোবোণী দিয়া শুন। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি—বিষয়লোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম্য কবি নাই। যাহাতে অনুরাগ তাহাই করিয়াছি, দারপরিগ্রহে অনুরাগ নাই, এছত্ত তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি আমাব নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত মনোরমা লাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী

অনুগ্রহ করেন, তবে দুই চারি দিনের মধ্যে রাজ্যলাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি কিধবা বলিয়া যে বিঘ্ন, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহাব খণ্ডন করিতে পারিব। কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, তুমি কুলীনকণ্ঠা, জনার্দন শর্মা কুলীনশ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোত্রিয়।”

মনোরমা এ সকল কথায কর্ণপাত করিতেছিল কি না সন্দেহ। পশুপতি দেখিলেন যে মনোরমা চিত্ত হাবাইয়াছে। পশুপতি, মরলা অবিকৃত। বালিকা, মনোরমাকে ভালবাসিতেন,—প্রোঢ়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মনোরমাকে ভয় করিতেন। কিন্তু অগ্ৰ ভাবান্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তথাপি পুনরুত্তম করিয়া পশুপতি কহিলেন, “কিন্তু কুলরীতি, শাস্ত্রমূলক নহে, কুলনাশে ধর্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় না। তাঁহার অজ্ঞাতে যদি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতিই কি? তুমি সম্মত হইলেই, তাহা পারি। পবে তোমার পিতামহ জানিতে পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।”

মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল শ্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটা কুঞ্চবর্ণ মার্জ্জার তাহার নিকটে আসিয়া, বসিয়াছিল, সে সেই

বিনাসহজেব মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল।
'পরাইতে মালা খুলিয়া' গেল। মনোরমা তখন আপন
মস্তক হইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া, তৎসহজে আঁকব
মালা গাঁথিতে লাগিল।

পশুপতি উত্তব না পাইয়া নিঃশব্দে মালাকুমুমধ্যে
মনোরমাব অনুপম অঙ্গুলির গতি মুঞ্চলোচনে দেখিতে
লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

— ০০ —

বিহঙ্গী পিঞ্জরে

পশুপতি মনোরমার বুদ্ধিপ্রদীপ জ্বালিবার অনেক
যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলোৎপত্তি কঠিন হইল।
পরিশেষে বলিলেন, “মনোরমা, রাত্রি অধিক হইয়াছে।
আমি শয়নে যাই।”

মনোরমা অস্মানবদনে কহিলেন—“যাও।”

পশুপতি শয়নে গেলেন না। বসিয়া মালা গাঁথা
দেখিতে লাগিলেন। আবার উপায়ান্তর স্বরূপ, ভয়সূচক

চিন্তার আবির্ভাবে কার্যসিদ্ধ হইবেক ভাবিয়া, মনোরমাকে ভীতা করিবার অন্ত পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, যদি ইতিমধ্যে যখন আইসে, তবে তুমি কোথায় যাইবে?”

মনোরমা মালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, “বাটীতে থাকিব।”

পশুপতি কহিলেন, “বাটীতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে?”

মনোরমা পূর্ববৎ অন্ত মনে কহিল, “জানি না; নিরুপায়।”

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ?”

ম। দেবতা প্রণাম করিতে।

পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, “তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোবমা, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন—তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না?”

মনোরমার মালা গাঁথা সম্পন্ন হইয়াছিল—সে তাহা একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের গলায় পরাইতেছিল। পশুপতির কথা কণ্ঠে গেল না। মার্জ্জার মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল—যতবার মনোরমা মালা তাহার

‘গলায় দিতেছিল; ততবার সে মালার ভিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লাইতেছিল—মনোরমা কুন্দনিন্দিত দন্তে অধরদংশন করিয়া ঈষৎ হাসিতেছিল, আর আবার মালা তাহার গলায় দিতেছিল। পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চণেটাঘাত করিলেন—বিড়াল উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া দূবে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে কবচ মালা পশুপতিবই মস্তকে পরাইয়া দিল।

মার্জ্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অল্প ক্রোধ হইল—কিন্তু দংশিতাধরা হাস্যময়ীর তৎকালীন অনূপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লক্ষ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উন্নত-ফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল।

পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন; ক্রমে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা প্রোচবয়ঃপ্রফুল্লমুখী মহিমাময়ী সুন্দরী।

পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, দোষ ভাবিও না।

তুমি আমার পত্নী,—আমাকে বিবাহ কর ।” মনোরমা
পশুপতির মুখ প্রতি তীব্র কটাক্ষ কবিধা কহিল,

“পশুপতি ! কেশবের কন্যা কোথায় ?”

পশুপতি কহিলেন; “কেশবের মেয়ে কোথায় জানি
না—জানিতেও চাচ্ছি না । তুমি আমার একমাত্র পত্নী ।”

মম আমি জানি কেশবের মেয়ে কোথায়—বলিব ?

পশুপতি অবাক হইয়া মনোবমাব মুখপ্রতি চাহিয়া
রহিলেন । মনোবমা বলিতে লাগিল,

“একজন জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে,
কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমুতা
হইবে । কেশব এই কথায়, অল্পকালে মেয়েকে হারাইবাব
ভয়ে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন । তিনি ধর্ম্মনাশের ভয়ে
মেয়েকে পাত্ৰস্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবাব
ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন
করিলেন । তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার
মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কশ্মিন্ কালে না পাইতে
পারেন । দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশ-
বের মৃত্যু হইল । তাঁহার মেয়ে পূর্বেই মাতৃহীনা
হইয়াছিল—এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচা-
র্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন । মৃত্যুকালে

কেশব, আচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন, “এই অনাথা মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন । ইহার স্বামী পশুপতি—কিন্তু জ্যোতির্বিদেয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্পবয়সে স্বামীর অনুমুতা হইবেন । অতএব আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন যে, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহাব স্বামী । অথবা পশুপতিকে কখন জানাইবেন না যে ইনি তাঁহার স্ত্রী ।”

“আচার্য্য সেই রূপ অঙ্গীকার করিলেন । সেই পর্যান্ত তিনি তাহাকে বিবাহস্থ করিয়া, প্রতিপালন করিয়া, তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন ।”

প। এখন সে কত্না কোথায় ?

ম। আমিই কেশবের মেয়ে—জনর্দ্দিন শর্মা তাঁহার আচার্য্য ।

পশুপতি চিত্ত হাবাইলেন, তাঁহার মস্তক ঘূবিত্তে লাগিল । তিনি বাঙনি ত্তি না করিয়া প্রতিমাসুমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন । পরে গাত্রোথান করিয়া মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন । মনোরমা পূর্ব্ববৎ সরিয়া দাঁড়াইল । কহিল,

“এখন নয়—আরও কথা আছে ।”

প। মনোরমা—বান্ধসী ! এতদিন কেন আমাকে এ অন্ধকারে বাধিয়াছিলে ?

ম। কেন ! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে ?

প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অবিশ্বাস করিয়াছি ? আব যদিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনার্দন শর্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম ।

ম। জনার্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন ? তিনি শিষ্যের নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন ।

প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন ?

ম। তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই । একদিন গোপনে ব্রাহ্মণীকে নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন । আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম । আবও আমি বিধবা বলিয়া পবিচিতা । তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিলে লোকে প্রত্যয় করিবে কেন ? তুমি লোকেব কাছে নিঃশয় না হইয়া, কি প্রকাবে আমাকে গ্রহণ করিতে ?

প। আমি সকল লোককে একত্র করিয়া তাহা-দিগকে বুঝাইয়া বলিতাম ।

ম। ভাল, তাহাই হউক,—জ্যোতির্বিদের গণনা ?

প। আমি গ্রহশান্তি করাইতাম । ভাল, যাহা

হইবাব তাহা হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে যদি আমি বড় পাইযাছি, তবে অগ্নি তাহা গলা হইতে নামাইব না । তুমি আব আমার ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না ।

মনোরমা কহিল, “এ ঘর ছাড়িতে হইবে । পশু-পতি ! আমি যাহা আজি বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলি শুন । এ ঘর ছাড় । তোমাব বাজালাভেব ছেবাশা ছাড় । প্রভুব অহিত চেষ্ঠা ছাড় । এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা কবি । সেইখানে আমি তোমাব চরণসেবা কষ্টিয়া জন্ম সার্থক কবিব । যে দিন আমাদিগের আয়ুঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা কবিব । যদি ইহা স্বীকার কর-আমাব ভক্তি অচলা থাকিবে । নহিলে—”

প । নহিলে কি ?

মনোরমা তখন উন্নতমুখে, সবাস্পলোচনে, দেবী-প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে, গদগদবর্ণে কহিল “নহিলে, দেবীসমক্ষে শপথ কবিতেনি, তোমায় বা আমার এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না ।”

পশুপতিও দেবীসমক্ষে বক্রাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াই-
লেনও বলিলেন,

“মনোরমা—আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন

থাকিতে 'তুমি আমার বাড়ী' ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না । মনোরমা, আমি 'যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিবিবাব উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম— তোমাকে লইয়া সর্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম । কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি । আব ফিবিবাব উপায় নাই—যে গ্রস্থি বাধিয়াছি তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভানাইয়া আব ফিরাইতে পারি না । যাহা ঘটাব তাহা ঘট্যাছে । তাই বলিয়া কি আমাব পবমস্থখে আমি বঞ্চিত হইব ? তুমি আমাব স্ত্রী, আমার কপালে যাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী কবিব । তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কব—আমি শীঘ্র আসিতেছি ।" এই বলিয়া পশুপতি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন । মনোরমার চিত্তে সংশয় জন্মিল । সে চিন্তিতান্তঃকবনে কিয়ৎক্ষণ মন্দির মধ্যে দাড়াইয়া বহিল । আর একবাব পশুপতির নিকট বিদায় না লইয়া যাইতে পারিল না ।

অল্পকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন । বললেন, "প্রাণাধিকা ! আজি আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না । আমি সকল দ্বার বন্ধ কবিয়া আসিয়াছি ।"

মনোরমা বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

যবনদূত—যমদূত বা ।

বেলা প্রহরেকের সময় নগবাসীবা বিম্বিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিতজাণয় সম্পদশ অধাবোহী পুরুষ রাজপথ অত্রিবাহিত কবিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে । তাহাদিগের আকাবেপিত দেখিয়া নববীপ বাসীবা পাদ কবিত্তে লাগিল । তাহাদিগের শবীব আনত, দাঘ অথচ পুঠি ; তাহাদিগেব বর্ণ তপ্তবাক্ষন-সন্নিভ ; তাহাদিগেথ মুখমণ্ডল বিস্তুত, ঘনকৃষ্ণশ্রবাজ্জি-বিভূষিত ; নযন প্রশস্ত, জ্বালাবিশিষ্ট । তাহাদিগেব পবিচ্ছদ অনর্থক চাকচিক্যবিবাজ্জিত ; তাহাদিগের যোদ্ধ-বেশ ; সর্বাঙ্গে প্রহরণজ্বালমণ্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ।

“আর যে সকল সিন্ধুপাব জাণ অর্ধপৃষ্ঠে তাহাবা আবোহণ কবিয়া যাইতেছিল, তাহাবাই বা কি মনোহর !” পর্বত-শিলাখণ্ডের ঞ্চার বৃহদাকার, বিমার্জিতদেহ, বক্রগ্রীব, বন্ধারোধ-অসহিষ্ণু, তেজোগর্বে নৃত্যশীল ! আরোহীয়া কি বা তচ্চালন-কৌশলী—অবঙ্গীলাক্রমে সেই ক্রুদ্ধবানু-

তুল্য ভেজঃপ্রথর অশ্ব সকল দমিত করিতেছে । দেখিয়া
গোড়াসীরা বহুতর প্রশংসা করিল ।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দূত প্রতিজ্ঞায় অধবোষ্ঠ সংশ্লিষ্ট
করিয়া নীবে রাজপুবাভিমুখে চলিল । কোতুহলবশতঃ
কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী
একজন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, “ইহারা
যবন রাজার দূত ।” এই বলিয়া ইহারা প্রান্তপাল ও
কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল—এবং পশু-
পতিব আজ্ঞাক্রমে সেই পবিচয়ে নির্বিঘ্নে নগরমধ্যে
প্রবেশ লাভ করিল ।

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বাবে উপনীত হইল । বৃদ্ধ-
রাজার শৈথিল্যে অীব পশুপতির কোশলে রাজপুত্রী
প্রায় রক্ষকহীন । রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল—পুরীমধ্যে
কেবল পোরজন ছিল মাত্র—অল্পসংখ্যক দৌবারিক দ্বার
বন্ধা করিতেছিল । একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল,
“তোমরা কি জন্ত আসিয়াছ ?”

যবনেরা উত্তর করিল, “আমরা যবন রাজপ্রতিনিধির
দূত ; গোড়াবাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব ।”

দৌবারিক কহিল, “মহারাজাধিরাজ গোড়েশ্বর এক্ষণে
অস্তঃপুরে গমন করিয়াছেন—এখন সাক্ষাৎ হইবে না ।”

যবনেবা নিষেধ না শুনিয়া মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ কবিত্তে উত্তত হইল। সৰ্বাগ্রে একজন ধৰ্মকায়, দীৰ্ঘ-বাহু কুকপ, যবন। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দৌবারিক তাহাব গতিবোধজন্ত শূলহস্তে তাহাব সম্মুখে দাঁড়াইল। কাহিল, “ফেব—নচেৎ এখনই মাবিব।”

“আপনিই তবে মর!” এই বলিয়া ক্ষুদ্রাকাব যবন দৌবারিককে নিজকরস্থ তববাবে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগেব মুখাবলোকন কবিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কাহিল, “এক্ষণে আপন আপন কার্য্য কর।” অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বাবাহীদিগেব মধ্য হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুথিত হইল। তখন সেই ষোড়শ যবনেব কুটিবন্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিক্ষেপিত হইল—এবং অশনিসম্পাতসদৃশ তাহাবা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ কবিল। দৌবারিকেব বণসজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ নিবন্ধোগে জাক্রান্ত হইয়া আত্মবন্ধাব কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রকায় যবন কাহিল, “যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুৰী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।”

তখন যবনেব পুরমধ্যে তাড়িতের গায় প্রবেশ করিয়া

বালবৃদ্ধবনিতা পৌরজন যথানে যাহাকে দেখিল তাহাকে অসি দ্বাৰা ছিন্নমস্তক, অথবা শূলোগ্রে বিদ্ধ, কবিল ।

পৌরজন তুমুল আৰ্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন কবিতে লাগিল । সেই ঘোব আৰ্ত্তনাদ, অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ বাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথা প্রবেশ করিল । তাহার মুখ শুকাইল । জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কি ঘটিয়াছে—যবন আসিয়াছে ?”

পলায়নতৎপর পৌরজনেবা কহিল, “যবন সকলকে বধ কবিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে ।”

কবলিত অনগ্রাস রাজাব মুখ হইতে পড়িয়া গেল । তাহার শুষ্কশবীর জলস্রাতঃপ্রহত বেতুসের গ্রাঘ কাপিতে লাগিল । নিকটে রাজমহিষী ছিলেন—রাজা ভোজন-পাত্ৰের উপব পড়িয়া যান দেখিয়া, মহিষী তাহার হস্ত ধরিলেন ; কহিলেন,

“চিন্তা নাই—আপনি উঠুন ।” এই বলিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন । রাজা কলের পুত্তলিকার স্তম্ভ দাঁড়াইয়া উঠিলেন ।

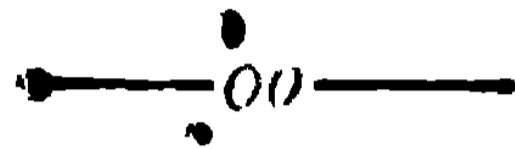
মহিষী কহিলেন, “চিন্তা কি ? নৌকার সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কী দ্বার দিয়া সোপারগাঁ বাত্মা করি ।”

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধোত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কৌদ্রাবপথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন । সেই রাজ-কুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গোড়বাজ্যের রাজহস্তীও যাত্রা করিলেন ।

ষোড়শ সহস্র লইয়া মর্কটাকার বখতিয়ার খিলিজি গোডেশ্বরের বাজপুত্রী অধিকার করিল ।

ষষ্টি বৎসর পবে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন । ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে ? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পবাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত ? মনুষ্য মুষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত মন্দেই নাই । মন্দভাগিনী, বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক !

পঞ্চম পারচ্ছেদ ।



জাল ছিঁড়িল ।

গোড়েশ্বৰপুৰে অবিষ্ঠিত হইয়াই বখতিয়ার খিলিজি ধৰ্ম্মাধিকাৰেৰ নিকট দূত প্ৰেৰণ কৰিলেন । ধৰ্ম্মাধিকাৰেৰ সহিত সাক্ষাতেৰ অভিলাষ জানাইলেন । তাঁহাৰ সহিত যদনেৰ সন্ধিনিবন্ধন হইয়াছিল, তাহাৰ ফলোৎপাদনেৰ সময় উপস্থিত !

পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্ৰণাম কৰিয়া, কুপিত মনোবম্বাৰ নিকট বিদায় লইয়া, কদাচিত উল্লসিত—কদাচিত শঙ্কিত চিত্তে যবনসমীপে উপস্থিত হইলেন । বখতিয়ার খিলিজি গাত্ৰোথান কৰিয়া সুদৃবে তাঁহাৰ অভিবাদন কৰিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা কৰিলেন । পশুপতি বাজভ্ৰত্যাৰ্ণেৰ রক্তনদীতে চরণ প্ৰক্ষালন কৰিয়া আসিয়াছেন, সহসাকোন উত্তৰ দিতে পাৰিলেন না । বখতিয়ার খিলিজি তাঁহাৰ চিত্তেৰ ভাব বুঝিতে পাৰিয়া কহিলেন,

“পণ্ডিতবর ! রাজসিংহাসন আরোহণের পথ কুম্ভাবৃত

নহে । এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অস্থিমুণ্ড সর্বদা পদে বিদ্ধ হয় ।”

পশুপতি কহিলেন, “সত্য । কিন্তু যাহারা বিবেচী, তাহাদিগেবই বধ আবশ্যক । ইহারা নির্যিবোধী ।”

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, “আপনি কি শোণিতপ্রবাহ দেখিয়া, নিজ অস্বীকার স্ববণে অসুখী হইতেছেন ?”

পশুপতি কহিলেন, “যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্য কবিব । মহাশয়ও যে তদ্রূপ কবিবেন, তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই ।”

বখ্‌ । কিছুমাত্র সংশয় নাই । কেবলমাত্র আমাদিগেব এক যাত্রা আছে ।

প । আজ্ঞা করুন ।

ব । কুতব্‌উদ্দীন গোঁড় শাসন ভাঙ্গ আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন । আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন । কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কল্প এই যে, ইসলামধর্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহাব রাজকার্যে সন্নিপ্ত হইতে পারিবে না । আপনাকে ইসলামধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে ।

পশুপতির মুখ শুকাইল । তিনি কহিলেন, “সন্ধির সময়ে এরূপ কোন কথা হয় নাই ।”

ব। যদি না হইয়া থাকে, তবে সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আর এ কথা উত্থাপিত না হইলেও আপনাব শ্রায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বারা অনায়াসেই অনুমিত হইয়া থাকিবে। কেন না এমন কখনও সম্ভবে না যে, মুসলমানেবা বাঙ্গালা জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে বাজ্য দিবে।

৭। আমি বুদ্ধিমান বলিয়া আপনাব নিকট পবিচিত হইতে পারিলাম না।

ব। না বুঝিয়া থাকেন এখন বুঝিলেন; আপনি যবনধর্ম অবলম্বনে শিবসঙ্কল্প হউন।

প। (সদর্পে) আমি শিবসঙ্কল্প হইয়াছি যে, যবনসম্রাটের সাম্রাজ্যের জগৎও সনাতনধর্ম ছাড়িয়া নরকপামী হইব না।

ব। ইহা আপনাব ভ্রম। যাহাকে সনাতন ধর্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজা মাত্র। কোরাণ-উক্ত ধর্মই সত্য ধর্ম। মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল পরকালেব মঙ্গলসাধন করুন।

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। তাহার অভিপ্রায় এট মাত্র যে, কার্যসিদ্ধি করিয়া নিবন্ধ সন্ধি ছলক্রমে ভঙ্গ করিবে। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে; বলক্রমে করিবে। অতএব কপুটের সহিত কাপট্য

অবলম্বন না কাঁবয় দর্প করিয়া ভাল ক'বেন নাই । তিনি ক্রমেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, “যে আজ্ঞা । আমি আজ্ঞানুবর্তী হইব ।”

বখতিয়ারও তাঁহাব মনের ভাব বুঝিলেন । বখতিয়ার যদি পশুপতির অপেক্ষা চতুৰ না হইতেন, তবে এত সহজে গোড়জয় করিতে পারিতেন না । বহুভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না ; চাতুর্য্যেই ইহার জয় । চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান ।

বখতিয়ার কহিলেন, “ভাল, ভাল । আজ আমাদিগের শুভ দিন । একুপ কার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই । আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইস্লামের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন ।”

পশুপতি দেখিলেন, শার্কনাশ ! বলিলেন, “একুবাৰ মাত্র অবকাশ দিউন, পরিবারগণকে লইয়া আসি, সপরিবাবে একুবাবে দীক্ষিত হইব ।”

বখতিয়ার কহিলেন, “আমি তাঁহাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি । আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম করুন ।”

প্রহরী আসিয়া পশুপতিকে ধরিল । পশুপতি

ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “সে কি ? আমি কি বন্দী হইলাম ?”

বখুতিয়ার কহিলেন, “আপাততঃ তাহাই বটে !”.

পশুপতি, রাজপুৰীমধ্যে, নিরুদ্ধ হইলেন । উৰ্ণনাভেব জাল ছিঁড়িল—সে জালে কেবল সে স্বয়ং জড়িত হইল ।

অমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত কবিযাছি । পাঠক মহাশয় বলিবেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস কবিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগেব অধিকৃত পুৰীমধ্যে প্রবেশ কবিল, তাহার চতুৰতা কোথায় ? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি কবেন । এ বিশ্বাস না কবিলে যুদ্ধ করিতে হয় । উৰ্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না ।

সেই দিন রাত্ৰিকালে, মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল । নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল । • যে সূৰ্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহাব উদয় হইল না । আর কি উদয় হইবে না ? উদয় অন্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পিঞ্জর ভাঙ্গিল ।

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনো-
রমাকে নবনে নয়নে রাখিয়াছিলেন । যখন তিনি যবনদর্শনে
গেলেন, তখন তিনি গৃহেব সকল দ্বাব বন্ধ কবিয়া শান্ত
শীলকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া গেলেন ।

পশুপতি যাইবাগাত্র, মনোরমা পলায়নের উদ্যোগ
কবিতে লাগিল । গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান কবিতে
লাগিল । পলায়নের উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিল
না । অতি উর্ধ্বে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল, কিন্তু
তাহা ছুবাবোহণীয় ; তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্যশবীর, নির্গত
হইবার সম্ভাবনা ছিল না ; আর তাহা ভূমি হইতে এত
উচ্চ যে, তথা হইতে লক্ষ দিয়া ভূমিতে পড়িলে অস্থি
চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা । মনোরমা উন্মাদিনী ; সেই
গবাক্ষপথেই নিষ্ক্রান্ত হইবার মানস কবিল ।

অতএব পশুপতি যাইবার ক্ষণকাল পরেই, মনো-
রমা পশুপতির শয়্যাগৃহে পালঙ্কের উপর আরোহণ

করিল । পালক্ হইতে গবাক্কাবোইণ সুলভ হইল ।
 পালক্ হইতে গবাক্ অবলম্বন করিয়া, মনোরমা গবাক্-
 রক্ দিয়া প্রথমে দুই হস্ত, পশ্চাৎ মস্তক, পরে বক্ পর্য্যন্ত
 বাহিব করিয়া দিল । গবাক্‌নিকটে উদ্যানস্থ একটি
 আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা দেখিল । মনোরমা তাহা
 ধারণ করিল ; এবং তখন পশ্চাষ্টাগ গবাক্ হইতে
 বহিষ্কৃত করিয়া, শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল ।
 কোমল শাখা তাঁহার ভরে নমিত হইল ; . তখন ভূমি
 তাঁহার চবণ হইতে অনতিদূরবর্তী হইল । মনোরমা
 শাখা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িল ।
 এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জুনাদিনেব গৃহাভিমুখে
 চলিল ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

-০০-

যবনবিপ্লব ।

সেই নিশীথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্মত্ত যবনসেনার
 নিস্পীড়নে, বাতাসস্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ

চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ ভূবি ভূরি অশ্বাবোহিগণে,
ভূবি ভূরি পদাতিদলে, ভূবি ভূবি খজা, ধানুকী, শূলী-
সমূহসমাবোহে, আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সৈন্যহীন
রাজধানীব নাগরিকেবা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ
কবিল; দ্বার বন্ধ করিয়া সভয়ে ইষ্টনাম জপ কবিত্তে
লাগিল।

যবনেরা রাজপথে যে দুই একজন হতভাগ্য আশ্রয়
হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাঁহাদিগকে শূলবিদ্ধ কবিয়া
বন্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ কবিত্তে লাগিল।
কোথায়ও বা দ্বাব ভগ্ন কবিয়া, কোথায়ও বা প্রাচীর
উল্লঙ্ঘন কবিয়া, কোথায়ও বা শঠতা পূর্বক ভীত গৃহস্থকে
জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ কবিত্তে লাগিল। গৃহ প্রবেশ
করিয়া, গৃহস্থের সর্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রীপুরুষ, বৃদ্ধ,
বনিতা, বালক সকলেবই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্বক
কবিত্তে লাগিল। কেবল যুবতীব পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম।

শোণিতে গৃহস্থেব গৃহ সকল প্লাবিত হইতে লাগিল।
শোণিতে রাজপথ পূর্ণিল হইল। শোণিতে যবনসেনা
রক্তচিত্রময় হইল। অপহৃত দ্রব্যজাতের ভাবে অশ্রুব
পৃষ্ঠ এবং মনুষ্যের স্কন্ধ পীড়িত হইতে লাগিল। শূলাগ্রে
বিদ্ধ হইয়া প্রাক্গণেব মুণ্ড সকল ভীষণভাবে ব্যক্ত কবিত্তে

লাগিল। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অশ্বেব গলদেশে তুলিতে
লাগিল। সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলা সকল যুবন-পদাঘাতে
গড়াইতে লাগিল।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাস পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।
অশ্বেব পদধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর বৃষ্টিত,
যবনের জয়শব্দ, তদুপবি পীড়িতের আর্তনাদ। মাতাব
বোদন, শিশুব বোদন, বৃদ্ধের ককণাকাজ্জা, যুবতীব
কণ্ঠবিদাব।

যে বীব পুরুষকে মাধবাচার্য্য এত যত্নে যবনদমনার্থ
নবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা ?

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে, হেমচন্দ্র বণোন্মুখ
নহেন। একাকী বণোন্মুখ হইয়া কি করিবেন ?

হেমচন্দ্র তখন আপন গৃহেব শয়নমন্দিরে, শয্যোপবি
শয়ন করিয়াছিলেন। নগরক্রমণেব কোলাহল তাঁহাব
কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“কিসেব শব্দ ?”

দিগ্বিজয় কহিল, “যবনসেনা নগর আক্রমণ করিয়াছে।”

হেমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বখ-
তিয়ারকর্তৃক বাজপুবাধিকার এবং বাজাব পলায়নের
স্বভাব শুনে নাই। দিগ্বিজয় তদ্বিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল।

হেমচন্দ্র কাহিলেন, “নাগরিকেরা কি করিতেছে ?”

দি। যে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে সে প্রাণ হারাইতেছে ।

হে। আর গৌড়ীয় সেনা ?

দি। কাহার জন্ত যুদ্ধ করিবে ? বাজা ত পলাতক ।
সুতরাং তাহারা আপন আপন পথ দেখিতেছে ।

হে। আমার অশ্বসজ্জা কর ।

দিগ্বিজয় বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায়
যাইবেন ?”

হে। নগরে ।

দি। একাকী ?

হেমচন্দ্র ক্রকুটী করিলেন । ক্রকুটী দেখিয়া দিগ্বিজয়
ভীত হইয়া অশ্বসজ্জা করিতে গেল ।

হেমচন্দ্র তখন মহামূল্য বৃগসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন । এবং ভীষণ শূলহস্তে
নির্ঝারিণী প্রেরিত জলবিষবৎ সেই অসীম যবন সেনা-
সমুদ্রে কাঁপ দিলেন ।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনেবা যুদ্ধ করিতেছে না,
কেবল অপহরণ করিতেছে । যুদ্ধজন্ত কেহই তাহাদিগের
সম্মুখীন হইল না, সুতরাং যুদ্ধে তাহাদিগেরও মন ছিল

না । যাহাদিগেব, অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই, অপহরণকালে বিনা যুদ্ধে মা'বিতেনি। সুতবাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট কবিবার কোন উযোগ কবিল না ।, যে কোন যবন তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহাব সহিত একা যুদ্ধোত্তম করিল, সে তৎক্ষণাৎ ম'বিল।

হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন । তিনি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষাধ আসিয়াছিলেন, কিন্তু যবনেবা পূর্বেই বিজয়লাভ করিয়াছে, অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত বীতিমত যুদ্ধ করিল না । তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “একটা একটা কবিয়া গাছেৰ পাতা ছিঁড়িয়া, কে অরণ্যকে নিষ্পত্র, কবিত্তে পারে ? একটা একটা যবন মা'বিয়া কি করিব ? যবন যুদ্ধ কবিত্তেছে না—যবনবধেই বা কি মুখ ? বরং গৃহীদেব, রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল ।” হেমচন্দ্র তাহাই কবিত্তে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । দুইজন যবন তাঁহাব সহিত যুদ্ধ করে, অপব যবনে সেই অবসরে গৃহস্থদিগের সর্বস্বান্ত করিয়া চলিয়া যায় । যাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের উপকার করিত্তে লাগিলেন । পথপার্শ্বে এক কুটার মধ্য হইতে হেমচন্দ্র আৰ্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন । যবনকর্তৃক

আক্রান্ত ব্যক্তিব' আর্তনাদ বিবেচনা' কবিতা' হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিলেন ।

দেখিলেন গৃহমধ্যে যবন নাই । কিন্তু গৃহমধ্যে যবন-দৌর অ্যেব চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই যাহা আছে তাহাব ভগ্নাবস্থা, আব এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্তনাদ কবি, তেছে । সে এ প্রকার গুরুতব আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে মৃত্যু আসন্ন । হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে যবনভ্রমে কহিতে লাগিল ।

“আইস—প্রহার কর—শীঘ্র মরিব—মারি—আমাব মাথা লইয়া সেই বৃক্ষসীকে দিও—আঃ—প্রাণ যায়—জল ! জল ! কে জল দিবে !”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার ঘবে জল আছে ?”

ব্রাহ্মণ কাতবোক্তিতে ঐহিতে লাগিল, “জানি না—গনে হয় না—জল ! জল ! পিশাচী !—সেই পিশাচীব জল প্রাণ গেল ।”

হেমচন্দ্র কুর্গীবমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল আছে । পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জল-দান করিলেন । ব্রাহ্মণ কহিল, “না !—না ! জল খাইব না ! যবনের জল খাইব না ।” হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমি

যবন নহি, আমি হিন্দু—আমার হাতের জল পান করিতে পাব। আমাব কথায় বুঝিতে পারিতেছ না ?”

ব্রাহ্মণ, জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন,
“তোমার আর কি উপকার কবিব ?”

ব্রাহ্মণ কহিল, “আর কি কবিবে ? আর কি ? আমি মরি মরি। যে মরে তাহার কি করিবে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমাব কেহ আছে ? তাহাকে তোমার নিকট বাখয়া যাইব ?”

ব্রাহ্মণ কহিল, “আর কে—কে আছে ? ডের আছে। তার মধ্যে সেই ব্রাহ্মসী ! সেই ব্রাহ্মসী—তাহাকে—বালও—বলিও আমার অপ—অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে।”

হেমচন্দ্র । কে সে ? কাহাকে বলিব ?

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল, “কে সে পিশাচী ! পিশাচী চেন না ? পিশাচী মৃগালিনী—মৃগালিনী ! মৃগালিনী—পিশাচী।”

ব্রাহ্মণ অধিকতর আর্তনাদ করিতে লাগিল।—হেমচন্দ্র মৃগালিনীর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “মৃগালিনী তোমার কে হয় ?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “মৃগালিনী কে হয় ? কেহ না—আমার যম।”

হেমচন্দ্র । মৃগালিনী তোমার কি কবিয়াছে ?

ব্রাহ্মণ । কি কবিয়াছে ?—কিছু না—আমি—আমি
তাব দুর্দশা কবিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল—

হেমচন্দ্র । কি দুর্দশা কবিয়াছ ?

ব্রাহ্মণ । আব কথা কহিতে পাবি না, জল দাও ।

হেমচন্দ্র পুনর্বার তাহাকে জলপান কবাইলেন ।

ব্রাহ্মণ জলপান কবিয়া স্থিৰ হইলে হেমচন্দ্র তাহাকে
জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তোমাব নাম কি ?”

ব্রা । ব্যামকেশ ।

হেমচন্দ্রের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্কুলিঙ্গু নির্গত হইল ।
দন্তে অধব দংশন কবিলেন । কবস্থ শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ
কবিয়া ধবিলেন । আবার তখনই শান্ত হইয়া কাহলেন,

• “তোমাব নিবাস কোথায় ?”

ব্রা । গোড়—গোড় জান না ? মৃগালিনী আমাদের
বাড়ীতে থাকিত ।

হে । তাব পব ?

ব্রা । তার পর—তার পর আর কি ? তাব পব
আমাব এই দশা—মৃগালিনী পাপিষ্ঠা ; বড় নির্দয়—
আমাব প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না । রাগ কবিয়া আমাব
পিতাব নিকট আমি তাহার নামে মিছা কলঙ্ক রটাই-

লাম । পিতা তাহাকে বিনা দোষে তাড়াইয়া দিলেন ।
রাক্ষসী—বাক্সী আমাদের ছেড়ে পেল ।

হে । তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন ?

ব্রা । কেন ?—কেন ? গালি—গালি দিই ? মৃগা-
লিনী আমাকে ফিবিয়া দেখিত না—আমি—আমি
তাহাকে দেখিয়া জীবন—জীবন ধারণ করিতাম । সে
চলিয়া আসিল, সেই—সেই অবধি আমার সর্বস্ব ত্যাগ,
তাহাব জন্ত কোন্ দেশে—কোন্ দেশে না গিয়াছি—
কোথায় পিশাচীব সন্ধান না করিয়াছি । গিরিজায়া—
ভিখাবীর মেয়ে—তার আশ্রয় বলিয়া দিলু—নবদ্বীপে আসি-
য়াছে—নবদ্বীপে আশ্রিতাম—সন্ধান নাই । যবন—যবন,
হস্তে মরিলাম, রাক্ষসীব জন্ত মরিলাম—দেখা হইলে
বলিও—আমার পাপেব ফল ফুলিল ।

• আব ব্যোমকেশের কথা সবিল না । সে পরিশ্রমে
একেবাবে নিজেব হইয়া পড়িল । নির্বাণোন্মুখ দীপ
নিবিল ! ক্ষণপরে, বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ
প্রাণত্যাগ করিল ।

হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না । আর যবন বধ
করিলেন না—কোন মতে পথ করিয়া গৃহাভিমুখে
চলিলেন ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।



মৃগালিনীর স্মৃতি কি ?

যেখানে হেমচন্দ্র তাঁহাকে সোপানপ্রস্তুরাধাতে, বাঁধিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—মৃগালিনী এখনও সেইখানে । পৃথিবীতে যাইবার আব স্থান ছিল না—সর্বত্র সমান হইয়াছিল । নিশা প্রভাতা হইল, গিরিজায়া যত কিছু বলিলেন—মৃগালিনী কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে বসিয়া রহিলেন । স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল—গিরিজায়া তাঁহাকে জলে নামাইয়া স্নান করাইল । স্নান করিয়া মৃগালিনী আর্দ্রবসনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন । গিরিজায়া স্বয়ং ক্ষুধাতুবা হইল—কিন্তু গিরিজায়া মৃগালিনীকে উঠাইতে পারিল না—সাহস করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না । স্মৃতরাং নিষ্কটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্ত মৃগালিনীকে দিল । মৃগালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন না । প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল—ক্ষুধার অনু-রোধে মৃগালিনীকে ত্যাগ করিল না ।

এইরূপে পূর্বাচলের সূর্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য পশ্চিমে গেলেন। সূর্য্য হইল। গিরিজায়া দেখিলেন যে, তখনও মৃগালিনী গৃহে প্রত্যর্গমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চলা হইলেন। পূর্ব্ববাত্র জাগরণ গিয়াছে—এ রাত্রিও জাগরণেব আকাব। গিরিজায়া কিছু বলিল না—বৃক্ষপল্লব সংগ্রহ কবিয়া সোপানোপরি আপন শয্যা রচনা কবিল। মৃগালিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, “তুমি ঘবে গিয়া শোও।”

গিরিজায়া মৃগালিনীক কথা শুনিয়া, আনন্দিত হইল। বলিল, “একত্র যাইব।”

মৃগালিনী বলিলেন, “আমি যাইতেছি।”

গি। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা কবিব। ভিখারিণী দুইদণ্ড পাতা পাতিয়া শুইলি ক্ষতি কি? কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সস্বন্ধ ঘুচি—তবে আর কার্তিকের হিমে অধমরা কষ্ট পাই কেন?

মৃ। গিরিজায়া—হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সস্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—সে উঠিয়া বসিল । বলিল, “কি ঠাকুবাণী! তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাঁহার দাসী—তবে আমি চলিলাম—আমাব এখানে আব প্রয়োজন নাই ।

মৃ । গিরিজায়া—যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও । হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুত্র—আমাব স্বামী; তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না ।

গিরিজায়া আরও বাগ কবিলু । বহুযত্নবচিত্ত পর্ণশয্যা ছিন্ন ভিন্ন কবিতা ফেলিয়া দিতে লাগিল । কাঁইল, “পাষণ্ড বলিব না?—একবার বলিব?” (বলিয়াই কতকগুলি শয্যাবিণ্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) “একবার বলিব?—দশবার বলিব” (আবার পল্লব নিক্ষেপ)—“শতবার বলিব” (পল্লব নিক্ষেপ)—“হাজারবার বলিব ।” এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল । গিরিজায়া বলিতে লাগিল, “পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন?”

মৃ । সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম ।

গি। ঠাকুরাণী ! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।

মৃগালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন।

গি। কি দেখিলে ?

মৃ। বেদনা।

গি। কেন হইল ?

মৃ। মনে নাই।

গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে—
তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাতবে পড়িয়া তোমার
মাথায় লাগিয়াছে।

মৃগালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছু মনে
পড়িল না। বলিলেন, “মনে হয় না ; বোধ হয়, আমি
আপনি পড়িয়া গিয়া থাকি।”

গিবিজ্ঞায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, “ঠাকুরাণী। এ
সংসাবে আপনি সুখী।”

মৃ। কেন ?

গি। আপনি রাগ করেন না।

মৃ। আমিই সুখী—কিন্তু তাহা বজ্র নহে।

গি। তবে কি ?

মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।



নবম পারচ্ছেদ ।

— ০০ —

স্বপ্ন ।

গিরিজায়া কহিল, “গৃহে চল ।” মৃগালিনী বলিলেন,
“নগবে এ কিসেব গোলযোগ ?” তখন যবনসেনা নগর
মহন করিতেছিল ।

তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল । গিবি-
জায়া বলিল, “চল এই বেলা সতর্ক হইয়া যাই ।” কিন্তু
দুই জন বাজপথেব নিকট পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের
কোন উপায়ই নাই । অগত্যা প্রত্যাগমন করিয়া সর্বোবব-
সোপানে বসিলেন । গিরিজায়া বলিল, “যদি এখানে
উহাৰা আইসে ?”

মৃগালিনী নীববে রহিলেন । গিবিজায়া আপনিই
খলিল, “বনেব ছায়ামধ্যে এমন লুক্কইব—কেহ দেখিতে
পাইবে না ।”

উভয়ে আসিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিয়া
রহিলেন ।

মৃগালিনী ধানবদনে গিবিজায়াকে কহিলেন, “গিবি-
জায়া, বুঝি আমার সুখার্থই সর্বনাশ উপস্থিত হইল ।”

গি । সে কি !

মৃ । এই এক অখারোহী গমন করিল ; ইনি হেম-
চন্দ্রের সখি—নগরে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে ; যদি নিঃসহায়ে
প্রভু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন—না জানি কি বিপদে
পড়িবেন !

গিবিজায়া কোন উত্তর কবিতো পারিল না । তাহাব
নিদ্রা আসিতেছিল । কিষ্কণ্ড পবে মৃগালিনী দেখিলেন
যে, গিবিজায়া ঘুমাইতেছে ।

মৃগালিনীও, একে আহারনিদ্রাভাবে দুর্বলা—তাহাতে
সমস্ত রাত্রিদিন, মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন,
সুতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শবীৰ বহে না—তাহারও তন্দ্রা
আসিল । নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । দেখি-
লেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্বসমরে বিজয়ী হইয়াছেন ।
মৃগালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়া
ছিলেন । রাজপথে হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাৎ, কত
হস্তী, অশ্ব পদাতি যাইতেছে । মৃগালিনীকে যেন সেই
সেনাতবন্ধ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—
তখন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্যবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া

ঠাঁচাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন । তিনি যেন 'হেমচন্দ্রকে বলিলেন, "প্রভু! অনেক যত্নপা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না ।" হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, "আর কখন তোমায় ত্যাগ করিব না ।" সেই কণ্ঠস্বরে যেন—

ঠাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, "আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না" জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন । চক্ষু উন্মীলন করিলেন—কি দেখিলেন? যাহা দেখিলেন, তাহা বিশ্বাস হইল না । আবার দেখিলেন সত্য! হেমচন্দ্র সম্মুখে!—হেমচন্দ্রে বলিতেছেন—“আব একবার ক্ষমা কব—আব কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না ।”

নিরভিমানিনী, নিলজ্জা মৃগালিনী আবার ঠাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্বল্পে মস্তক রক্ষা করিলেন ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

—::—

শ্রেম—নানা প্রকারে

আনন্দাশ্রুপ্লাবিত-শরদনা মৃগালিনীকে হেমচন্দ্র হস্তে ধরিয়া উপবন-গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন । হেমচন্দ্র

মৃগালিনীকে একবার অপমানিতা, তিরস্কৃত, ব্যথিতা করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আবার আপনি আসিয়াই তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন,—ইহা দেখিয়া গিবিজায়া বিস্মিতা হইল, কিন্তু মৃগালিনী একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, একটা কথাও কহিলেন না। আনন্দপারিপ্লববিবশা হইয়া বসনে অশ্রুক্রতি আবৃত কবিয়া চলিলেন। গিবিজায়াকে ডাকিতে হইল না—সে স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপবনবাটিকায় মৃগালিনী আসিলে, তখন উভয়ে বহুদিনেব হৃদয়েব কথা সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন হেমচন্দ্র, যে যে ঘটনায় মৃগালিনী প্রতি তাঁহার চিত্তের বিরাগ হইয়াছিল আর যে যে কারণে সেই বিরাগের ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। তখন মৃগালিনী যে প্রকারে স্বর্ষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল বলিলেন। তখন উভয়েই হৃদয়ের পূর্বোদিত কত ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন উভয়েই কত ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কল্পনা করিতে লাগিলেন; তখন কতই নূতন নূতন প্রতিজ্ঞার বন্ধ হইতে লাগিলেন। তখন উভয়ে নিতান্ত নিশ্চয়োজন কত কথাই অতি প্রয়োজনীয়

কথার স্তায় আশ্রয় সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন কতবার উভয়ে মোক্ষোন্মুখ অশ্রুজল কণ্ঠে নিবারিত করিলেন। তখন কতবার উভয়ের মুখ প্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুব হাসি হাসিলেন ;—সে হাসিব অর্থ “আমি এখন কত সুখী!” পরে যখন প্রভাতোদয়সূচক পক্ষিগণ বব কবিয়া উঠিল, তখন কতবার উভয়েই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, আজি এখনই বাত্রি পোহাইল কেন ?—আর সেই নগর মধ্যে যরনবিপ্লবেব যে কোলাহল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বীচি-ববৎ উঠিতেছিল—আজ হৃদয়-সাগরের তবঙ্গরবে সে বব ডুবিয়া গেল।

উপবন-গৃহে আর এক স্থানে অব একটা কাণ্ড হইয়া ছিল। দিগ্বিজয় প্রভুব আজ্ঞামত রাত্রি জাগরণ করিয়া গৃহবন্ধা করিতেছিল, মৃগালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তখন সে দেখিয়া চিনিল। মৃগালিনী তাঁহাব নিকট অপরিচিতা ছিলেন না—যে কারণে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃগালিনীকে দেখিয়া দিগ্বিজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা সম্ভাবনা নাই, কি করে ? ক্ষণেক পরে গিরিজারাও আসিল দেখিয়া দিগ্বিজয় মনে ভাবিল; “বুঝিয়াছি—ইহারা দুই জন গোড় হইতে আমাদের দুইজনকে দেখিতে

আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুববাজকে দেখিতে আসিয়াছেন, আর এটা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই।” এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনাব গোঁপ দাড়ি চুমুরিয়া লইল, এবং ভাবিল, “না হবে কেন?” আবার ভাবিল, “এটা কিন্তু বড়ই নষ্ট—এক দিনের তরে কই আমাকে ভাল কথা বলে নাই—কেবল আমাকে গালিই দেয়—তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহাব সম্ভাবনা কি? যাহা হউক একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল—প্রভুও ফিবিয়া আসিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটুকু শুই। দেখি পিয়ারী আমাকে খুঁজিয়া নেয় কি না?” ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিবিজায়া তাহা দেখিল।

গিবিজায়া তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, “আমি ত মৃগালিনীর দাসী—মৃগালিনী এ গৃহের কর্তা হইবেন অথবা হইবেন—তবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম্য কবিবার অধিকার আমাবই।” এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিবিজায়া একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিবিজায়া আসিল

—মনে বড় আনন্দ হইল—তবে ত গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে । দেখি গিবিজায়া কি বলে ? এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়াই রহিল । অকস্মাৎ তাহাব শৃষ্ঠে হুম্ দাম্ করিয়া ঝাঁটাব ঘা পড়িতে লাগিল । গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, “আঃ মলো ঘর গুলায় ময়লা জমিয়া বহিয়াছে দেখ—এ কি ? এক মিন্লে । চোঁব নৃা কি ? মলো মিন্লে, রাজাব ঘবে চুবি !” এই বলিয়া আবাব সম্মার্জনীব আঘাত । দিগ্বিজয়ের পিট ফাটিয়া গেল ।

“ও গিবিজায়া আমি । আমি !”

“আমি ! আরে তুই বলিয়াই তু খাঙ্গবা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি ।” এই বলিবাব পর আবাব বিরশী সিকা ওজনে ঝাঁটা পড়িতে লাগিল ।

“দোহাই ! দোহাই ! গিরিজায়া ! আমি দিগ্বিজয় !”

“আবার চুবি করিতে এসে—আমি দিগ্বিজয় ! দিগ্বিজয় কে রে মিন্লে !” ঝাঁটার বেগ আর থামে না ।

দিগ্বিজয় এবার সকাতরে কহিল, “গিরিজায়া, আমাকে ভুলিয়া গেলে ?”

গিরিজায়া বলিল, “তোমার আমার সঙ্গে কোন্ পুরুষে আলাপ রে মিন্লে !”

দিগ্বিজয় দেখিল নিস্তার নাই—রণে ভঙ্গ দেওয়াই
পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া উর্দ্ধ্বাসে গৃহ
হইতে পলায়ন করিল। গিরিজায়া সম্বার্ক্জনী হস্তে তাহাব
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

—00—

পূর্ব পরিচয় ।

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের অনুসন্ধানে যাত্রা
করিলেন। গিরিজায়া আসিয়া মৃগালিনীর নিকট
বসিল।

গিরিজায়া মৃগালিনীর হৃৎখের ভাগিনী হইয়াছিল,
সহৃদয় হইয়া হৃৎখের সময় হৃৎখের কাহিনী সকল শুনিয়া-
ছিল। আজি সুখের দিনে সে কেন সুখের ভাগিনী না
হইবে? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সুখের কথা
কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃগালিনী
মহাধনীর কথা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ।
কিন্তু হৃৎখের দিনে গিরিজায়া মৃগালিনীর একমাত্র স্নহৎ,
সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুরন্দরিতে প্রভেদ থাকে

না ; আজি সেই বলে গিরিজায়া মৃগালিনীর হৃদয়ের
সুখের অংশাধিকাবিণী হইল ।

যে আলাপ হইতেছিল, তাহাতে গিরিজায়া বিস্মিত ও
প্রীত হইতেছিল । সে মৃগালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,
“তা এত দিন এমন কথা প্রকাশ কর নাই কি জন্ত ?”

মৃ। এত দিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন্ত প্রকাশ
করি নাই । এক্ষণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন,
এজন্ত প্রকাশ করিতেছি ।

গি। ঠাকুবানী ! সফল কথা বল না ? আমার
গুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে ।

তখন মৃগালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন,
“আমার পিতা একজন বুদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠী । তিনি
অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার
রাজকন্যার সহিত আমার সখিত্ব ছিল ।

আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় যমু-
নার জলবিহাবে গিয়াছিলাম । তথায় অকস্মাৎ প্রবল
বড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল । রাজ-
কন্যা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা
পাইলেন । আমি ভাসিয়া গেলাম । দৈবযোগে এক
রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন । তাঁহাকে

তখন 'চিনিতাম' না—তিনিই হেমচন্দ্র । তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন । জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন । আমি তখন অজ্ঞান ! হেমচন্দ্র আমাব পরিচয় জানিতেন না । তিনি তখন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন । তাঁহার বাসায় আমার লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন । আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমাব পরিচয় লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন । কিন্তু তিন দিবস পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি খামিল না । একপ দুদিন হইল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পাবে না । সুতরাং তিন দিন আমরাইগেব উভয়ে এক বাড়ীতে থাকিতে হইল । উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম । কেবল কুল-পরিচয় নহে—উভয়েই অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম । তখন আমার বয়স পনের বৎসর মাত্র । কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম । সে কোমল বয়সে সকল বুদ্ধিতাম না । হেমচন্দ্রকে দেবতার গ্রায় দেখিতে লাগিলাম । তিনি যাহা বলিতেন, তাহী পূবাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তিনি বলিলেন, 'বিবাহ কর ।' সুতবাং আমারও বোধ হইল, ইহা অবশ্য কর্তব্য । চতুর্থ দিবসে, দুর্ঘ্যোগের

উপশম দেখিয়া উপবাস কবিলাম ; দিগ্বিজয় উদ্যোগ
কবিয়া দিল । তীর্থপর্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত
সঙ্গে ছিলেন ! তিনি আমাদিগেব বিবাহ দিলেন ।”

গি। কন্যাসম্প্রদান কবিল কে ?

মু। অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব
ছিলেন । তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন । আমাকে
বালককাল হইতে লালনপালন কবিয়াছিলেন । তিনি
আমাকে অত্যন্ত স্নেহ কবিতেন ; আমার সকল দোষাত্মা
সহ করিতেন । আমি তাঁহাব নাম করিলাম ! দিগ্বিজয়,
কোন ছলে পুরমধ্যে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া
ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম ।
‘অরুন্ধতী মনে জানিতেন, আমি যমুনার ডুবিয়া মবিয়াছি ।
তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহ্লাদিত হইলেন
যে, আর কোন কথাতেই অসন্তুষ্ট হইলেন না । আমি
বাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন । তিনিই
কন্যাসম্প্রদান কবিলেন । বিবাহের পব মাসীর সঙ্গে
বাপের বাড়ী গেলাম । সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবা-
হেব কথা লুকাইলাম । আমি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, কুল-
পুরোহিত, আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ
জানিত না । অতঃপুর্বে জানিলে ।

গি । 'মাধবাচার্য্য জানেন' না ?

মৃ । না । তিনি জানিলে সর্বনাশ হইত । মগধ-
বাজ তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেন । 'আমার, বাপ বৌদ্ধ,
মগধবাজ বৌদ্ধেব বিষম শক্ ।

গি । ভাল-তোমার বাপ যদি তোমাকে এ পর্য্যন্ত
কুমারী বলিয়া জানিতেন, তবে এত বয়সেও তোমার
বিবাহ দেন নাই কেন ?

মৃ । বাপের দোষ নাই । তিনি অনেক যত্ন কবিয়া-
ছেন, কিন্তু বৌদ্ধ সুপাত্র পাওয়া স্কটিন ; কেন না বৌদ্ধ
ধর্ম্ম পায় লোপ হইয়াছে । পিতা বৌদ্ধ জামাতা চাহেন,
অথচ সুপাত্রও চাহেন । একপ একটি পাওয়া গিয়াছিল,
সে আমার বিবাহের পব । বিবাহের দিন স্থিব হইয়া
সকল উদ্যোগও হইয়াছিল । কিন্তু আমি সেই সময়ে
জ্বর কবিয়া বসিলাম । পাত্র অগ্ৰত বিবাহ কবিল ।

গি । ইচ্ছাপূর্বক জ্বব করিয়াছিলে ?

মৃ । হাঁ, ইচ্ছাপূর্বক । আমাদের উদ্যানে একটা
কুয়া আছে, তাহার জল কেহ স্পর্শ করে না । তাহার
পানে বা স্নানে নিশ্চিত জ্বর । আমি বাত্রিতে গোপনে
সেই জলে স্নান করিয়াছিলাম ।

গি । আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইকপ করিতে ?

মৃ। সন্দেহ কি? নচেৎ হেমচন্দ্রের নিকট পলাইয়া
বাইতাম।

গি। মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ। স্বীলোক
হইয়া কাহার সহায়ে পলাইতে?

মৃ। আমার সহিত সাক্ষাতের জ্ঞে হেমচন্দ্র মথুরায়
এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক বলিয়া
পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার কবিয়া তঁথায়
বাণিজ্য করিতে আসিতেন। যখন তিনি তথায় না থাকিতেন,
তখন দিগ্বিজয় তথায় তাঁহার দোকান বাখিত। দিগ্বিজয়ের
প্রতি আদেশ ছিল যে, যখন আমি যেরূপ আজ্ঞা করিব, সে
তখনই সেরূপ করিবে। সুতরাং আমি নিঃসহায় ছিলাম না।

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজায়া বলিল, “ঠাকুরাণী।
আমি একটা বড় গুরুতব অপবাদ কবিয়াছি। আমাকে
মার্জনা করিতে হইবে। আমি তাহাব উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
কবিতে স্বীকৃত আছি।”

মৃ। কি এমন গুরুতব কাজ কাবলে?

গি। দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী তাহা আমি
জানিতাম না, আমি জানিতাম ওটা অতি অপদার্থ।
এজন্য আমি প্রভাতে তাহাকে ভালরূপে ঘা কত কাটা
দিয়াছি। তা ভাল করি নাই।

মৃগালিনী হাসিয়া বলিলেন, “তা, কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?”

গি। ভিতরীর মেয়ের কি বিবাহ হয়?

মৃ। (হাসিয়া) করিলেই হয়।

তবে আমি সে অপনার্থটাকে বিবাহ করিব—আর কি কবি?

• মৃগালিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, “তবে আজি তোমার গায়ে হলুদ দিব।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

— ০০ —

পরামর্শ।

• হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে; আচার্য্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন,

“আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভূত্যের প্রতি আর কি আদেশ কবেন? যখন গোড় অধিকাব করিয়াছে। বুঝি, এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব

বিধিলিপি । নচেৎ, বিনা বিধানে যবনেরা গোড়জয় কবিল
কি প্রকাবে ? যদি এখন এই দেহ পঠন কবিলে, এক-
দিনেব তবেও জন্মভূমি দস্যব হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে
এইরূপে তাহা কবিতো প্রস্তুত আছি । সেই অভিধায়ে
বাত্মিতে যুদ্ধেব আশায় নগর মধ্যে অগ্রসব হইয়াছিলাম—
কিন্তু যুদ্ধ ত দেখিলাম না । কেবল দেখিলাম যে, এক
পক্ষ আক্রমণ কবিতোছে—অপর পক্ষ পলাইতেছে ।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “বৎস ! দুঃখিত হইও না ।
দৈবনির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে । আমি যখন
গণনা করিয়াছি যে, যবন পবাত্ত হইবে, তখন নিশ্চয়ই
জানিও তাহাবা পবাত্ত হইবে । যতনেবা নবদ্বীপ
অধিকাব কবিয়াছে ংটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গোড় নহে ।
প্রধান বাজা সিংহাসন ত্যাগ কবিয়া পলায়ন কবিয়াছেন ।
কিন্তু এই গোড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ বাজা আছেন ;
তাহাবা ত এখনও বিজিত হইয়েন নাই । কে জানে দে,
সকল বাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ কবিলে, যবন বিজিত
না হইবে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাহাব অল্পই সূত্ৰাবনা ।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হই
বাব নহে ; অবশ্য সফল হইবে । তবে আমার এক ভ্রম

হইয়া থাকিবে। পূর্বদেশে যবন পবাভূত হইবে—ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়া ছিলাম। কিন্তু গোড়বাজ্য ত প্রকৃত পূর্ব মহে—কামরূপই পূর্ব। বোধ হয়, তথায়ই আমরাই আশা ফলবতী হইবে।”

হে। কিন্তু এক্ষণে ত যবনেব কামরূপ যাওয়াব কোন সম্ভাবনা দেখি না।

মা। এই যবনেবা ক্ষণকাল স্থির নহে। গোড়ে ইহারা স্থির হইলেই কামরূপ আক্রমণ করিবে।

হে। তাহাও মানিলাম। এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ করিলে পবাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম। কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃবাজ্য উদ্ধারের কি সূচ্যপায় হইল ?

মা। এই যবনেরা এ পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ জয়লাভ করিয়া অজেয় বলিয়া বাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভয়ে কেহ তাহাদের বিবোধী হইতে চাহে না। তাহা একবার মাত্র পরাজিত হইলে, তাহাদিগের সে মহিমা আর থাকিবে না। তখন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আর্য্যবংশীয় রাজারা ধতান্ত্র হইয়া উঠিবেন। সকলে এক হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে যবনেরা কত দিন তিষ্ঠিবে ?

হে । গুরুদেব ! আপনি আশামাত্রের আশ্রয়
লইতেছেন ; আমিও তাহাই করিলাম । এক্ষণে আমি
কি করিব—আজ্ঞা করুন ।

মা । আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম । এ
নগরমধ্যে তোমাব আব অবস্থিতি করা অকর্তব্য ; কেন
না যবনেবা তোমাব মৃত্যুসাধন সঙ্কল্প কবিয়াছে । আমার
আজ্ঞা - তুমি অতীত এ নগর ত্যাগ করিবে ।

হে । কোথায় যাইব ?

মা । আমার সঙ্গে কামরূপ চল ।

হেমচন্দ্র অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া, মূঢ় মূঢ়
কহিলেন, “মৃগালিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন ?”

মাধবাচার্য্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সে কি ! আমি
ভাবিতেছিলাম যে, তুমি কালিকার কথায় মৃগালিনীকে
চিহ্ন হইতে দূর করিয়াছিবে !”

হেমচন্দ্র পূর্বের শ্রায় মূঢ়ভাবে বলিলেন, “মৃগালিনী
অত্যাঙ্গা । তিনি আমাব পরিণীতা স্ত্রী ।”

মাধবাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন । রুষ্ট হইলেন । ক্ষোভ
কবিয়া কহিলেন, “আমি ইহার কিছু জানিলাম না ?”

হেমচন্দ্র তখন আশ্চোপাশু উহার বিবাহের বৃত্তান্ত
বিবৃত করিলেন । শুনিয়া মাধবাচার্য্য কিছুক্ষণ মৌনী

হইয়া রহিলেন । কহিলেন, যে স্ত্রী অসঙ্গাটাবিণী, সে ত শাস্ত্রানুসারে ত্যাগ্যা । যুগালিনীর চরিত্রসম্বন্ধে যে সংশয়; তাহা কালি প্রকাশ করিয়াছি ।”

তখন হেমচন্দ্র বেণুমকেশের বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ কবিয়া বলিলেন । তুমি মাধবাচার্য্য আনন্দ প্রকাশ কবিলেন । কহিলেন,

“বৎস! বড় প্রীত হইলাম । তোমার প্রিয়তমা এবঞ্চ গুণবতী ’ভার্য্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি । এক্ষণে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমবা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্ম্মাচরণ কর । যদি তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কার্য্যরূপ যাইতে অনু-
রোধ করি না । আমি অগ্রে যাইতেছি । যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমাব’ নিকট’ কার্য্যরূপাধিপতি দূত প্রেবণ করিবেন । এক্ষণে তুমি বধূকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর—অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও ।

এইরূপ কথোপকথনের পর, হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের নিকট বিদায় হইলেন । , মাধবাচার্য্য আশীর্বাদ, আলিঙ্গন করিয়া সাক্ষরলোচনে তাঁহাকে বিদায় করিলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

মহম্মদ আলিব প্রায়শ্চিত্ত ।

যে রাত্রে রাজধানী যবন-সেনা বিপ্লবে পীড়িতা হইতে ছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগারে অববদ্ধ ছিলেন । নিশাবশেষে সেনা-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল । মহম্মদ আলি তখন তাহারি সম্ভাষণে আসিলেন । পশুপতি কহিলেন,

“যবন ।—প্রিয় সম্ভাষণে আব আবশ্যকতা নাই । এক ষার তোমাবই প্রিয়সম্ভাষণে বিশ্বাস কবিয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি । বিধর্মী যবনকে বিশ্বাস কবিবাব যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি । এখন আমি মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া অন্ত ভরসা ত্যাগ করিয়াছি । তোমাদিগের কোন প্রিয় সম্ভাষণ গুনিব না ।”

মহম্মদ আলি কহিল, “আমি প্রভুব আজ্ঞা প্রতিপালন করি—প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি । আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে হইবে ।”

পশুপতি কহিলেন, সে বিষয়ে চিত্ত স্থির করুন। আশ্রম এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণ-ত্যাগ করিতে স্মৃকৃত আছি—কিন্তু যবনধর্ম অবলম্বন করিব না।

ম। আপনাকে এক্ষণে যবনধর্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্য যবনের পোষাক পরিধান করিতে বলিতেছি।

প। ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্তু স্নেহে বশে পরিব ?

ম। আপনি ইচ্ছাপূর্বক না করিলে, আপনাকে বলপূর্বক পাইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান।

পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে যবনবেশ পরাইলেন। কহিলেন, “আমার সঙ্গে আসুন।”

প। কোথায় যাইব ?

ম। আপনি বন্দী—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ?

মহম্মদ আলি তাঁহাকে সিংহদ্বারে লইয়া চলিলেন।

যে ব্যক্তি পশুপতির নক্ষত্র নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বারে প্রহরিগণের জিজ্ঞাসামতে মহম্মদ আলি আপন পরিচয় দিলেন ; এক সঙ্কেত করিলেন। প্রহরিগণ

তাঁহাদিগকে যাইতে দিল। সিংহদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন জনে কিছু দূর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন যবনসৈন্য নগরমহন সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সুতরাং রাজপথে আর উপদ্রব ছিল না। মহম্মদ আলি কহিলেন,

“ধর্ম্মাধিকার! আপনি আমাকে বিনা দোষে ক্লিরঙ্কার করিয়াছেন। বখতিয়ার খিলজির এরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্তাবহু হইয়া আপনার নিকট যাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া এরূপ দুর্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গদাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে—আপনি যথোচ্চ স্থানে প্রস্থান করুন। আমি এইখান হইতে বিদায় হই।”

পশুপতি বিশ্বয়াপন্ন হইয়া অবাক হইয়া রহিলেন। মহম্মদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, “আপনি এই রাত্রি মধ্যে এ নগর ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল প্রাতে যবনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ ঘটবে। খিলিজির আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিলাম—ইহার সাক্ষী এই প্রহরী। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্ত

ইহাকেও দেশান্তরিত করিলাম । ইহাকেও আপনাব নৌকায় লইয়া যাইবেন ।”

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন । পশুপতি কিয়ৎকাল বিষয়াপন্ন হইয়া থাকিয়া গঙ্গাতীরভিমুখে চলিলেন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জন ।

মহম্মদ আলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত কবিয়া পশুপতি ধীবে ধীরে চলিলেন । ধীবে ধীরে চলিলেন—যবনের কাষাগাব হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতগমনক্রমে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না । রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনাব মনোমধ্যে আপনি মরিলেন । তাঁহার প্রতিপদে মৃত নাগরিকের দেহ চরণে বাঞ্ছিতে লাগিল ; প্রতিপদে শোণিতসিক্তকর্দমে চরণ স্পর্শ হইতে লাগিল । পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য—বহুগৃহ ভস্মীভূত ; কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও

জলিতেছিল। গৃহস্থের দ্বার ভগ্ন—গবাক্ষ ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ
 ভগ্ন—তত্পরি মৃতদেহ! এখনও কোন হতভাগ্য মরণ-
 মন্ত্রণায় অমাত্মিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ
 সকলের মূল তিনিই। দারুণ লেটভেব বশবর্তী হইয়া
 তিনি এই বাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি
 মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য-
 পাত্র বটে—কেন মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত কবিয়া কাবা-
 গার হইতে পলায়ন করিলেন? যখন তাঁহাকে ধৃত
 করুক—অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক—মনে করিলেন
 কবিয়া যাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্টদেবীকে স্মরণ কবি-
 লেন—কিন্তু কি কামনা কবিবেন? কামনার বিষয় আব
 কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগনের নক্ষত্র-
 চন্দ্র-গ্রহমণ্ডলীবিভূষিত সহস্র পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে
 সহিল না—তীব্র জ্যোতিঃস্পীড়িতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত
 করিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয়
 আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ
 করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম
 কবির জন্ত পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন
 —এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিস্কৃত
 রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত-

কলেবরে পুনরুত্থান কবিলেন। আর দাঁড়াইলেন না —
 দ্রুত পদে চলিলেন। সহসা আর এক কথা মনে পড়িল—
 তাঁহার নিজ বাটী? তাহা কি যবন হস্তে রক্ষা পাইয়াছে?
 আব, সে রাঢ়ীতে যে কুমুমময়ী প্রাণ-পুতালিকে লুকাইয়া
 রাখিয়াছিলেন, তাহার কি হইয়াছে? মনোরমার কি
 দশা হইয়াছে? তাঁহার প্রাণানিকা, তাঁহাকে পাপপথ
 হইতে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার
 পাপসাগরের তবন্ধে ডুবিয়াছে। এ যবনসেনাপ্রবাহে
 সে কুমুম কলিকা না জন্মি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

পশুপাত উন্নতের ঞ্চায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটলেন
 আপনাব ওবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যাহা
 ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—জলন্ত পর্বতের ঞ্চায়
 তাঁহার উচ্চুড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জ্বলিতেছে।

দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, যব-
 নেনা তাঁহার পৌরজন সহ মনোবমাকে বধ করিয়া গৃহে
 অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল
 তাহা তিনি কিছু জানিতে পাবেন নাই।

নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সংবাদ
 প্রদান করে। আপন বিকল চিত্তেব সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ
 করিলেন। হলাহল-কলস পরিপূর্ণ হইল—হৃদয়ের শেষ

তথা 'ছিড়িল' তিনি কিম্বৎক্ষণ বিফ্রাবিত নয়নে দহমান অটোলিকা প্রতি চাহিয়া রহিলেন—মরণোন্মুখ পতঙ্গবৎ অল্পক্ষণ বিকলশরীরে, একস্থানে অবস্থিতি করিলেন—শেষে মহাবেগে সেই অনল তরঙ্গমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সূক্ষ্ম প্রহরী চমকিত হইয়া বহিল।

মহাবেগে পশুপতি অলস্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল—বিষ পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া আপন শরন কর্কে গমন করিলেন—কাঠাকেও দেখিলেন না। দগ্ধ শব্দে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার অন্তর মধ্যে যে ছবস্ত অগ্নি জলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহুদাহ যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারিলেন না।

ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন ঋণ্ড সকল অগ্নি কড়ক আক্রান্ত হইতেছিল। অক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উত্থাপিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশ্মিসম্পাতশব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূমে, ধূলিতে, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিফুলিঙ্গ আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল।

দাবানলসংবেষ্টিত আবগগজেব অগ্নি পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্ততঃ দাসদাসী স্বজন ও মনেবিমার অন্বেষণ করিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন । কাহাবও কোন চিহ্ন পাইলেন না—হতাশ হইলেন । তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল । দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির, অগ্নি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলতেছে । পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মাধ্য প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে অদ্বৈত স্বর্ণ প্রতিমা বিবাজ করিতেছে । পশুপতি উন্মত্তেব স্ত্যাক্ত কহিলেন,

“মা ! জগদম্ব । আব তোমাকে জগদম্বা বলিব না । আব তোমায় পূজা করিব না । তোমাকে প্রণামও করিব না । আশৈশব আমি কাঞ্চননোক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদ ধ্যান ইচ্ছন্যে সাব কবিয়াছিলাম—এখন, মা এক দিনের পাপে সর্ব্ব্ব হাবাইলাম । তবে কি জন্ত তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপ মতি অপনাত না করিলে ?”

মন্দিরদহন আগ্ন অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জিয়া উঠিল । পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ঐ দেখ । ধাতুমূর্তি !—তুমি ধাতুমূর্তি মাত্র, দেবী নহ—ঐ দেখ অগ্নি গর্জিতেছে ! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রবেণ করিবে । কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কাঁটি রাখিতে দিব

না—আমি তোমাকে স্থাণনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জন করিব। চল! ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গাব জলে বিসর্জন করিব।”

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জিয়া উঠিল। তখনই পশুপতিরানুরূপ প্রবল শব্দ হঠাৎ,—দক্ষ মন্দির, আকাশপথে ধূলিধূমভঙ্গ্য সহিত বাগ্নি-ক্ষুণ্ণিত বাণি প্রেবণ করিয়া, চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সঙ্গীতন সমাধি হইল।

৫

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

—oo—

অস্তিত্বকালে ।

পশুপতি স্বয়ং অষ্টভুজাব অর্চনা করিতেন বটে—কিন্তু তথাপি তাহার নিত্য সেবার জন্ত দুর্গাদাস নামে এক জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। নগবাবপ্লবের পব দিবস দুর্গাদাস শ্রুত হইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ অষ্টভুজার মূর্তি ভস্ম হইতে উদ্ধার

কবিয়া আপন গৃহে স্থাপন কবিবার মঙ্গল করিলেন ।
 ববনেরা নগর লুঠ কবিয়া তৃপ্ত হইলে, বখতিয়ার খিলিজি
 অনর্থক নগববাসীদিগের পীড়ন নিষেধ কবিয়া দিয়া-
 ছিলেন । সুতরাং এক্ষণে সাহস করিয়া বাঙ্গালীরা
 রাজপথে বাহিব হইতেছিল । ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস
 অপর্যুহে অষ্টভুজার উদ্ধারে পশুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা
 করিলেন । পশুপতির ভবনে গমন কবিয়া, যথায় দেবীর
 মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন । দেখিলেন অনেক
 ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত না কবিলে, দেবীর প্রতিমা বিহি-
 ক্ত কবিতোপায়া যায় না । ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস আপন
 পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন । ইষ্টক সকল অর্ধদ্রবীভূত
 হইয়া পরস্পর লিপ্ত হইয়াছিল—এবং এখন পর্য্যন্ত সন্তপ্ত
 ছিল । পিতাপুত্র এক দীর্ঘিকা হইতে জলবহন কবিয়া
 তপ্ত ইষ্টক সকল শীতল করিলেন, এবং বহুকষ্টে
 তন্মধ্য হইতে অষ্টভুজার অঙ্গসন্ধান কবিতো লাগিলেন ।
 ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত হইলে তন্মধ্য হইতে দেবীর
 প্রতিমা আবিষ্কৃত হইল । কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে
 —এ কি ? সভয়ে পিতাপুত্র নির্বাক করিলেন যে,
 মনুষ্যেব মৃতদেহ বহিয়াছে ! তখন উভয়ে মৃতদেহ
 উত্তোলন কবিয়া দেখিলেন যে, পশুপতির দেহ ।

বিস্ময়চক্ৰ বাক্যেব পব দুর্গাদাস কছিলেন, “যে প্রকারেই প্রভুর এ দশা হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণেব এবঞ্চ প্রতিপালিতেষু কার্য্যে আমাদিগেব অবশ্য কর্তব্য । গঙ্গা-তীবে এই দেহ লইয়া আমরা প্রভুব সৎকার কবি চল ।”

এই বলিয়া দুইজনে প্রভুর দেহ বহন কবিয়া গঙ্গা-তীবে লইয়া গেলেন । তথায় পুত্রকে শববক্ষায় নিযুক্ত কবিয়া দুর্গাদাস নগবে কাষ্ঠাদি সৎকাবের উপযোগী সামগ্রীর অনুসন্ধানেন গমন কবিলেন । এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ কবিয়া গঙ্গাতীবে প্রত্যাগমন কবিলেন ।

তখন দুর্গাদাস পুত্রের আনুকূল্যে যথাশাস্ত্র দাহেব পূর্বগামী ক্রিয়া সুকল সমাপন কবিয়া সুগন্ধি কাষ্ঠে চিতা বচনা কবিলেন । এবং তদুপরি পশুপতির মৃত দেহ স্থাপন কবিয়া অগ্নি প্রদান করিতে গেলেন ।

কিন্তু অকস্মাৎ শ্মশানভূমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল? ব্রাহ্মণদ্বয় বিস্মিতলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, কক্ষকেণী, আনুলাসিতকুস্তলা, ভস্মধূসি-সংসর্গে বিবর্ণা, উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ করিতেছে । বসনী ব্রাহ্মণদিগেব নিকটবর্তিনী হইলেন । দুর্গাদাস স্তম্ভচিন্তে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “আপনি কে ?”

বমণী কাহলেন, “তোমরা কাহার সৎকার করিতেছ ?”

দুর্গাদাস কাহলেন, “মৃত ধর্ম্মাধিকার পশুপতির ।”

বমণী কাহিলেন, “পশুপতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল ?”

দুর্গাদাস কাহিলেন, “প্রাতে নগরে জনরব শুনিষা-
ছিল যে, তিনি যবনকর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়া কোন সুযোগে
রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিলেন । অল্প তাঁহার অট্টা-
লিকা ভ্রমসাৎ হইয়াছে দেখিয়া, ভ্রমমধ্য হইতে অষ্ট-
ভুজুর প্রতিমা-উদ্ধার মানসে গিয়াছিলাম । তথায় গিয়া
প্রভু মৃতদেহ পাইলাম ।”

বমণী কোন উত্তর করিলেন না । গম্ভাতীরে, সৈক-
তের উপর উপবেশন করিলেন । বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে ?” দুর্গাদাস কাহিলেন,
“আমরা ব্রাহ্মণ ; ধর্ম্মাধিকারের অর্থে প্রতিপালিত হইয়া-
ছিলাম । আপনি কে ?”

তরুণী কাহিলেন, “আমি তাঁহার পত্নী ।”

দুর্গাদাস কাহিলেন, “তাঁহার পত্নী বহুকাল নিরুদ্दिষ্টা ।
আপনি কি প্রকারে তাঁহার পত্নী ?”

যুৱতী কাহিলেন, “আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্ঠা ।
অনুমরণভয়ে পত্নী আমাকে এতকাল লুক্কায়িত রাখিয়া-

ছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি পুরাইবার
অন্ত আসিয়াছি।”

শুনিয়া পিতাপুত্রে শিহরিয়া উঠিলেন। চাহাদিগকে
নিকৃত্ব দেখিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন, “এখন স্ত্রীজাতির
কর্তব্য কাঙ্ক্ষ কবিব। তোমরা উদ্যোগ কর।”

হুর্গাদাস তরুণীকে অভিপ্রায় বুঝিলেন। পুত্রের মুখ
চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল?”

পুত্র কিছু উত্তর কবিল না। হুর্গাদাস তখন তরুণীকে
কহিলেন, “মা, তুমি বাঙ্গলা—এ কঠিন কার্যে কেন
প্রস্তুত হইতেছ?”

তরুণী ক্রভঙ্গী কনিয়া কহিলেন, “ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্মে
প্রবৃত্তি দিতেছ কেন?—ইহাও উদ্যোগ কব।”

তখন ব্রাহ্মণ আয়োজন অন্ত নগরে পুনর্বার চলিলেন।
গমনকালে বিধবা হুর্গাদাসকে কহিলেন, “তুমি নগরে
ঘাইতেছ। নগরপ্রান্তে বাঙ্গল উপদানবাটিকায় হেমচন্দ্র
নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহাকে বলিও,
মনোরমা গঙ্গাতীরে চিতাবোহন কবিতেছে—তিনি
আসিয়া একবার তাঁহার সৃষ্টিত সাক্ষাৎ করিয়া যাউন,
তাঁহাও নিকট ইহলোকে মনোরমার এই মাত্র ভিক্ষা।”

হেমচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণমুখে শুনিলেন যে, মনোরমা

পশুপতির মন্ত্রী পরিচয়ে তাঁহার অনুমুতা হইতেছেন, তখন তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হুর্গাদাসের সম্ভ্র-
বাহারে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার অতি
মলিনা, উন্মাদিনী মূর্তি, তাঁহার শিবগস্ত্রী, এখনও
অনিন্দাসুন্দর, মুখকাণ্ঠি দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ব জল
আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “মনোরমা !
ভগিনী । এ কি এ ?”

তখন মনোরমা, জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত সুবোববতুল্য স্থির
মূর্তিতে মৃগস্ত্রীরম্বরে কহিলেন, “ভাই, যে জল আমার
জীবন, তাহা আজি চবম সৌমা প্রাপ্ত হইরাছে। আজ
আমি আমার স্বামীকে সঙ্গে গমন করিব।”

মনোরমা সংক্ষেপে অস্ত্রের শ্রবণাভীত শবে হেমচন্দ্রের
নিকট পূর্বকথার পবিচয় দিয়া বলিলেন,

“আমাব স্বামী অপবিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া বাখিয়া
গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী।
আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমি তাহা
গ্রহণ করিও। নচেৎ পাপিষ্ঠ যবনে তাহা ভোগ
করিবে। তাহাব অল্পভাগ ব্যয় করিয়া জনাঙ্গিন শর্ম্মাকে
কাণীধামে স্থাপন করিবে। জনাঙ্গিনকে অধিক ধন দিও
না। তাহা হইলে যবনে কাড়িয়া লইবে। আমাব দাহের

পব, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্থের সন্ধান করিও । আমি যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁড়িলেই তাহা পাইবে । আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই জানে না ।” এই বলিয়া মনোবন্ধা যথা অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন ।

তখন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন । জনার্দনকে ও তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশে প্রণাম কবিয়া হেমচন্দ্রের দ্বাৰা তাঁহাদিগেব নিকট কড় স্নেহ-সূচক কথা বলিয়া পাঠাইলেন ।

পরে ব্রাহ্মণেবা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন । এবং শাস্ত্রীর আচরণান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান কবিলেন । নব বস্ত্র পরিধান কবিয়া, দিয়া পুষ্পমালা কর্ণে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তদুপবি আবো-হুণ কবিলেন । এবং সহস্র আননে সেই প্রজ্বলিত ছতর্শনরাশির মধ্যে উপবেশন কবিয়া, নিদাঘসমুপ্ত কুম্বকলিকার স্মায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ কবিলেন ।

পরিশিষ্ট ।

হেমচন্দ্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহান
কিয়দংশ জনার্দনকে দিয়া তাঁহাকে কাশী প্রেরণ কবি-
লেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্তব্য কি না, তাহ
মাধবাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা কবিলেন। মাধবাচার্য্য বলিলেন,
“এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বখ্তিয়াব
খিলিজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্তব্য; এবং তদভিপ্রায়ে
ইহা গ্রহণও উচিত। দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে অনেক
প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়া আছে। আমার পরামর্শ
যে, তুমি এই ধনেব দ্বারা তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন
কর, এবং তথায় যবনদমনোপুষ্টোগী সেনা সৃজন কর।
তৎসাহায্যে পশুপতির শত্রুর নিপাতসিদ্ধ কবিও।”

এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য্য সেই রাত্রিতেই হেম-
চন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন।
পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে লইলেন।
মৃগালিনী, গিরিজায়্য এবং দিগ্বিজয় তাঁহার সঙ্গে গেলেন।
মাধবাচার্য্যও হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্য স্থাপিত করিবার

জন্তু তাঁহাব সঙ্গে গেলেন । রাজ্য সংস্থাপন অতি সহজ কাজ হইয়া উঠিল, কেন না যবনদিগের ধর্মদেবিতার পীড়িত এবং তাঁহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্য 'লাগ' করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল ।

মাধবাচার্য্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইল । এইরূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্ঠবাবিহীন হইয়া উঠিল । ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল । অচিরে বমণীর রাজপুত্রী নির্মিত হইল । মৃগালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন ।

গিরিজায়ার সহিত দিগ্বিজয়ের পরিণয় হইল । গিরিজায়া মৃগালিনীর পরিচর্যায় নিযুক্তা রহিলেন, দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের কাষ্য পূর্ববৎ নিৰ্ব্বাহ করিতে লাগিলেন । কথিত আছে যে, বিবাহ অর্ধদি এমনি দিনই ছিল না, যে দিন গিরিজায়া এক আধ ঘা কাঁটার আঘাতে দিগ্বিজয়েব শরীর পবিত্র করিয়া না দিত । ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই দুঃখিত ছিলেন এমনি নহে । বরং একদিন কোন দৈব কারণবশতঃ গিরিজায়া কাঁটা মারিতে ভুলিয়া ছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষন্ন বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গিন্নি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না

কি ” বস্তুতঃ হুহারা যাবজ্জীবন পরমসুখে কলাভ্যাসপাত্ত
কবিয়াছিল ।

হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচাৰ্য্য
কামৰূপে গমন করিলেন । সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ
হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন ।
বখতিয়ার খিলিজি পরাহৃত হইয়া কামৰূপ হইতে দ্বীকৃত
হইলেন । এবং প্রত্যাগমনকালে অপমান ও কষ্টে তাঁহার
প্রাণবিয়োগ হইল । কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা করা এ
গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে ।

বুভুময়ী এক সম্পন্ন পাটনৌকে বিবাহ করিয়া হেম-
চন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়া বাস করিল । তথায় মৃগালিনীর
অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল । গিবিজায়া
ও বুভুময়ী চিরকাল “সই” “সই” রহিল ।

“মৃগালিনী মাধবাচাৰ্য্যের দ্বারা হৃষীকেশকে অনুরোধ
কবাইয়া মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন ।
মণিমালিনী রাজপুত্রী মধ্যে মৃগালিনীর সখি স্বরূপে বাস
করিতে লাগিলেন । তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পোরো-
হিত্যে নিযুক্ত হইলেন ।

শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাই-
বার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কন্দম্বতা

দেখাইয়া যখনদিগের পিঙ্গপাত্র হইবার চেষ্টা কষিতে
লাগিল । হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতক-
তার দ্বারা শীঘ্র সে মনস্থায়ী সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট বাজকাৰ্য্যে
নিযুক্ত হইল ।



